ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সূচীপত্র

১ম ভাগ

২য় ভাগ

প্রথম ভাগ

ইসলামী খেলাফত

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ✪ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ✪

অনুবাদঃ তোমাদের মধ্যকার ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন এই মর্মে যে, (১) তাদেরকে তিনি অবশ্য অবশ্য পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছিলেন (২) তিনি অবশ্য অবশ্য তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যার উপরে তিনি রাযী হয়েছেন মুমিনদের জন্য (৩) এবং তিনি অবশ্য অবশ্য তাদেরকে ভীতির পরিবর্তে শান্তি দান করবেন। তারা যেন আমার ইবাদত করে এবং আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করে। যারা এর পরে কুফরী করবে (অর্থাৎ খেলাফত প্রাপ্তির উক্ত নে'মতের না-শোকরী করবে), তারা ফাসেক্ব' *(নূর ৫৫)*। তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার *(৫৬)*।

শানে নুযূলঃ রবী' বিন আনাস আবুল 'আ-লিয়াহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ মক্কায় দশ বছর গোপনে দাওয়াতী কাজে অতিবাহিত করেন। এই সময় তাঁরা সর্বদা ভয়ের মধ্যে থাকতেন। তাদেরকে লড়াইয়ের অনুমতি দেওয়া হয়নি। বরং কাফির-মুশরিকদের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এখানেও তাদেরকে সর্বদা অস্ত্র সাথে নিয়ে দিবারাত্রি

অতিবাহিত করতে হ'ত এবং সর্বদা জানমালের ক্ষয়ক্ষতির ভয় ও ত্রাসের মধ্যে থাকতে হ'ত। একদিন জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা যুগ যুগ ধরে এইরূপ ভয়ের মধ্যে কাটাব? এমন দিন কি আসবে না যেদিন আমরা নিরাপদ হবো ও অস্ত্র ত্যাগ করব? তখন এই আয়াত নাযিল হয়। যেখানে তাদেরকে আরব-আজমের উপরে খেলাফত প্রদানের নিশ্চিত ওয়াদা করা হয়। যেমন ইতিপূর্বে খেলাফত দান করা হয়েছিল হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)-কে সমগ্র পৃথিবীর উপরে এবং বনু ইসরাঈলকে মিসর, শাম প্রভৃতি অঞ্চলের উপরে'। এভাবে ভীতির বদলে নিরাপত্তা এবং অস্থিতির বদলে স্থিতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানগণ পৃথিবীতে চালিতের বদলে চালকের স্থান দখল করে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।[১]

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে মুসলমানদেরকে তিনটি বিষয়ে ওয়াদা দান করেছেন। যেখানে শেষের দু'টিকে প্রথমটির বাস্তব ফল বলা যেতে পারে। (১) পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা প্রদান করা (২) ইসলামকে বিজয়ী দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করা (৩) ভীতির বদলে শান্তি দান করা।

আল্লাহ্র এই ওয়াদা খেলাফতে রাশেদাহ্র ত্রিশ বছরের শাসনকালে পূর্ণতা লাভ করেছে বলে অধিকাংশ মুফাসসির মত প্রকাশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুণ্য হাতে মক্কা, খায়বর, বাহরায়েন, হাযারামাউত, ইয়ামন ও সমগ্র আরব উপত্যকা বিজিত হয়। এমনকি হিজরের অগ্নি উপাসক ও দক্ষিণ সিরিয়ার মূতা সহ কতিপয় এলাকা থেকে তিনি জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস, মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকাস, ওমানের শাসকবর্গ ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ তৎকালীন পৃথিবীর সেরা ক্ষমতাগর্বী রাজন্যবর্গ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে সম্মানসূচক উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেন (ইবনু কাছীর)। তাঁর ওফাতের পরে ১ম খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন। ইরাকের বছরা ও সিরিয়ার দামেস্ক নগরী তাঁর আমলেই বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কিছু কিছু এলাকা ইসলামী খেলাফতের অধীনে চলে আসে। আবুবকর (রাঃ)-এর মাত্র আড়াই বছরের খেলাফত কাল (১১-১৩হিঃ/৬৩২-৬৩৪খৃঃ) শেষে তাঁরই

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৩১২-১৩; মুখতাছার তাফসীরে বাগাভী ২/৬৫০।

মনোনয়নক্রমে ওমর ফারূক (রাঃ) পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত হন। তিনি খলীফা হয়ে শাসন ব্যবস্থা এমন সুবিন্যস্ত করেন যে, নবীগণের পরে পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃংখল শাসন ব্যবস্থা আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। ওমর (রাঃ)-এর দশ বছরের খেলাফতকালে (১৩-২৩হিঃ/৬৩৪-৬৪৪খৃঃ) সিরিয়া ও ইরাক পুরোপুরি বিজিত হয়। সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ তাঁর করতলগত হয়। তাঁর হাতে তৎকালীন পৃথিবীর দুই পরাশক্তি রোম সম্রাট 'ক্বায়ছার' ও পারস্য সম্রাট 'কিসরা'-র সাম্রাজ্য সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। সিরিয়া, জর্ডান, প্যালেষ্টাইন ও মিসরের বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে গঠিত বাইজান্টাইন বা রোমান সাম্রাজ্য পূর্ণভাবে দখলীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত আলজেরিয়া, ফিলিস্তীন, আর্মেনিয়া, সাইলিসিয়া এবং আফ্রিকার বার্কা, ত্রিপোলী প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামী খেলাফত প্রসারিত হয়।

ওমর (রাঃ)-এর পরে ওছমান (রাঃ) খলীফা হন। তাঁর ১২ বছরের খেলাফতকালে (২৩-৩৫হিঃ/৬৪৪-৬৫৬ খৃঃ) ইসলামী হুকুমতের সীমানা আরও প্রসার লাভ করে। মুসলিম সেনাবাহিনী একদিকে যেমন কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান, হিরাট, কাবুল, গযনী প্রভৃতি এলাকা দখল করে। অন্যদিকে তেমনি আর্মেনিয়া, ত্বাবারিস্তান ও তিফলিশ অধিকার করে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীর এবং উত্তরে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পদানত করে। এই সময় নবগঠিত নৌবাহিনীর সাহায্যে সাইপ্রাস দ্বীপ দখলীভূত হয়। এইভাবে ওছমান (রাঃ)-এর শাসনকালে ইসলামী খেলাফত শুধু প্রাচ্যেই বিস্তৃতি লাভ করেনি বরং পাশ্চাত্যেও বিস্তৃতি লাভ করে। আলী (রাঃ)-এর ছয় বছরের খেলাফত কাল (৩৫-৪০হিঃ/৬৫৬-৬৬১খৃঃ) মূলতঃ গৃহযুদ্ধেই অতিবাহিত হয়।

অতঃপর উমাইয়া, আব্বাসীয় ও ওছমানীয় খেলাফত কালে বলা চলে যে, সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এবং ইউরোপের স্পেন ও বলকান অঞ্চলের কিছু অংশে ইসলামী খেলাফত সম্প্রসারিত হয়। যা ১৯২৪ সালে তুরস্কের সুলতান ৬ষ্ঠ মুহাম্মাদ-এর পতনের ফলে বিলুপ্ত হয়। ইসলামের চিরশত্রু ইহুদী-খৃষ্টানদের চালান করা মতবাদ তথাকথিত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মিথ্যা মোহে ভুলে তুরস্কের মুসলমানরা নিজেদের হাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত খেলাফতকে ধ্বংস করে। পৃথিবী থেকে ইসলামী খেলাফতের বিধ্বস্তি শেষে ইতিমধ্যে ৮০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অথচ এখনও মুসলমান জেগে ওঠেনি। বরং আজও

তারা মুসলিম ইমারত ও খেলাফতকে হত্যাকারী তথাকথিত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধোঁকাবাজির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

আলোচ্য আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুওয়াতের যথার্থতার অন্যতম প্রমাণ। আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খেলাফতে রাশেদাহ্‌র স্বর্ণযুগে নবুওয়াতের আদলে খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামী খেলাফত সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর ৫৬টি দেশে মুসলমানদের শাসন কায়েম রয়েছে। যদিও ইসলামী শাসন ও আইন বিধান অধিকাংশ দেশেই নেই।

আয়াতটি কেবলমাত্র খেলাফতে রাশেদাহ বা ছাহাবায়ে কেরামের যামানার জন্য খাছ নয়। বরং সকল যুগের মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য 'আম। সর্বযুগে পৃথিবীর সর্বত্র বা যেকোন প্রান্তে মুসলমানগণ এই শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَيَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الاسْلاَمِ، بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَذُلِّ ذَلِيْلٍ، إِمَّا يَعُزُّهُمُ اللّٰهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِّنْ أَهْلِهَا، أَوْيُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا. قُلْتُ: فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ– 'ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা ঝুপড়িও থাকবে না, যেখানে ইসলামের কলেমা প্রবেশ করবে না। হয় তারা ইসলাম কবুল করে সম্মানিত হবে, নয় কবুল না করে অসম্মানিত হবে ও ইসলামের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হবে। এইভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করবে'।[২] অত্র হাদীছ ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসারের সাথে সাথে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করে।

'আদী বিন হাতেম (রাঃ) একটি প্রতিনিধি দল নিয় রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাঃ)-এর দরবারে আগমন করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি 'হীরা' নামক স্থানটি চেন? তিনি বললেন, না। তবে নাম শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هذَ الأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِيْنَةُ مِنْ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ فِىْ غَيْرِ جِوَارٍ...، 'যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে আমি বলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাঁর এই শাসনকে

---

২. *আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত-আলবানী হা/৪২ 'ঈমান' অধ্যায়।*

পূর্ণতা দান করবেন। এমনকি অবস্থা এমন শান্তিময় হবে যে, হীরা থেকে একজন গৃহবধু একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মক্কায় আসবে ও বায়তুল্লাহ্‌র ত্বাওয়াফ শেষে পুনরায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিরাপদে ফিরে যাবে। কিসরা বিন হুরমুযের ধনভাণ্ডার বিজিত হবে এবং তা বিতরণ করা হবে এত বেশী পরিমানে যে, অবশেষে নেওয়ার লোক পাওয়া যাবে না। 'আদী বলেন, হীরা থেকে নিঃসঙ্গ কুলবধুকে একাকী এসে বায়তুল্লাহ্‌র যেয়ারত করতে দেখেছি এবং কিসরা বিন হুরমুযের সিংহাসন ও ধনভাণ্ডার বিজয়ে আমি নিজেই শরীক ছিলাম। এখন বাকী রইল তৃতীয়টি। সেটা নিশ্চয়ই বাস্তবতা লাভ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটার কথা বলেছেন (অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম বিজয় লাভ করা)।[৩]

আবুদাউদের বর্ণনায় এসেছে, وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضَرَ مَوْتَ - 'আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই এই (ইসলামী) শাসন পূর্ণতা লাভ করবে। এমনকি ছান'আ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত একজন সওয়ারী একাকী ভ্রমণ করবে। কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত সে কাউকে ভয় পাবেনা। তবে ভয় পাবে তার ছাগল পালের উপরে নেকড়ের আক্রমনের। কিন্তু তোমরা খুব ব্যস্ততা প্রকাশ করছ'।[৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ زَوَى لِيْ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِيْ مَا زَوَى لِيْ مِنْهَا 'আল্লাহ পাক আমাকে সমগ্র পৃথিবীকে একত্রিত করে দেখালেন। আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখলাম। সত্বর আমার উম্মতের শাসন ঐ সমস্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছানো হবে, যতদূর পর্যন্ত এলাকা আমাকে দেখানো হয়েছে'। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আমরা এখন সেই যুগ অতিবাহিত করছি, যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য কথা বলেন।[৫]

---

৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৩১৩ পৃঃ।*
৪. *ছহীহ আবুদাউদ, হা/২৩০৭ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১০৭; তাফসীরে কুরতুবী ১২/২৯৯ পৃঃ।*
৫. *মুসলিম, হা/২৮৮৯ 'ফিতান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৫; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৩১২, কুরতুবী ১২/২৯৮।*

ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের ধারা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

تَكُوْنُ النَّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَّاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَّرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ مَلِكاً عَاضاً فَيَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَّرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُوْنُ مَلِكاً جَبَرِياً فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَّرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ -

‘তোমাদের মধ্যে (১) নবুওয়াত থাকবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতঃপর তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর (২) নবুওয়াতের তরীকায় খেলাফত কায়েম হবে। আল্লাহ পাক যতদিন ইচ্ছা তা রেখে দেবেন। অতঃপর উঠিয়ে নেবেন।[৬] অতঃপর (৩) অত্যাচারী রাজাদের আগমন ঘটবে। আল্লাহ পাক স্বীয় ইচ্ছামত তাদেরকে বহাল রাখবেন। তারপর উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর (৪) জবর দখলকারী শাসকদের যুগ শুরু হবে। আল্লাহ পাক স্বীয় ইচ্ছামত তাদেরকে বহাল রাখবেন। অতঃপর উঠিয়ে নেবেন। এরপরে (৫) নবুওয়াতের তরীকায় পুনরায় খেলাফত কায়েম হবে। এই পর্যন্ত বলার পর আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) চুপ হ’য়ে গেলেন’।[৭]

উপরোক্ত হাদীছের আলোকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী এখন নামে ও বেনামে ৪র্থ যামানা অর্থাৎ জবর দখলকারী শাসকদের যামানা চলছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মীয় স্বৈরাচার এবং গণতন্ত্রের নামে দলীয় স্বৈরাচার ও নেতৃত্বের লড়াই এখন ঘরে ঘরে ও অফিসের চার দেওয়ালের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার এখন সন্ত্রাসীদের লালনকারী নেতা-নেত্রী ও শক্তিমানদের একচ্ছত্র অধিকারে। জাহেলী যুগের গোত্রদ্বন্দ্ব এখন নগ্ন রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী যালেমদের জয়জয়কার

---

৬. আবুদাউদ, তিরমিযী, আহমাদ প্রভৃতির বর্ণনায় এই খেলাফতের মেয়াদ স্পষ্টভাবেই চার খলীফার আমলে ত্রিশ বছর বলে উল্লেখিত হয়েছে, যা হাসান (রাঃ)-এর খেলাফত সহ ১১হিঃ হ’তে ৪১ হিঃ সনের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। আলবানী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৪৫৯।

৭. আহমাদ, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৫।

চলছে। মাযলূম মানবতা সর্বত্র ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানবতা আজ ব্যাকুল হ'য়ে চেয়ে আছে এক সর্বব্যাপী রেনেসাঁর দিকে। পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিপ্লবের দিকে, একটি নির্ভেজাল আদর্শ ও তার নির্ভেজাল অনুসারীদের দিকে। সে আদর্শ আর কিছুই নয়। তা হ'ল 'ইসলাম'। প্রচলিত 'পপুলার' ইসলাম নয়, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক 'পিওর' ইসলাম। সেই ইসলামের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হ'লেই তবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে কাংখিত ইসলামী সমাজ ও কল্যাণময় ইসলামী খেলাফত। আলোচ্য আয়াতে সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য যার ওয়াদা করা হয়েছে।

তবে ইবনু খালদূন (৭৩২-৮০৮হিঃ/১৩৩২-১৪০৫খৃঃ), আবুবকর ইবনুল আরাবী (৪৬৪-৫৪৩হিঃ), মুহেব্বুদ্দীন আল-খাত্বীব (১৩০৩-১৩৮৯হিঃ) প্রমুখদের মতে এই হাদীছ সকলের নিকটে ছহীহ নয়। অধিকন্তু এটি বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, পৃথিবীতে ১২ জন ন্যায়পরায়ণ খলীফার আবির্ভাব সম্পর্কে।[৮] সেকারণ উক্ত বিদ্বানগণ সহ অন্যান্য বিদ্বানগণের মতে খেলাফতে রাশেদাহ্র মেয়াদ ৩০ বছরে সীমায়িত নয়। বরং চার খলীফার পরেও যুগে যুগে উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন খলীফাদের আগমন ঘটেছে ও ঘটবে। যেমন উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১হিঃ/৭১৭-৭২০খৃঃ), আব্বাসীয় খলীফা হারূনুর রশীদ (১৭০-১৯৩হিঃ/৭৮৬-৮০৯খৃঃ) এবং তাঁদের অনুরূপ অনেক খলীফা এবং সবশেষে ইমাম মাহদী।[৯] অতএব উক্ত হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফাদের নমুনা হ'লেন প্রথম চারজন খলীফা। অতঃপর তাঁদের পরবর্তী খলীফাগণ তুলনামূলক ভাবে কমবেশী হবেন।

ইসলামী খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন আদর্শ, যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছে। যার মধ্যে সকল যুগের সকল মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইসলাম মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য সুস্পষ্ট ও স্থায়ী মঙ্গলের পথনির্দেশ দান করেছে। কতগুলি

---

৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৭৪ 'মর্যাদা সমূহ' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৩১।*

৯. *আবুদাঊদ, সনদ হাসান; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৬০৪ 'মাহদী' অধ্যায়; আলবানী-মিশকাত হা/৫৪৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত-আফলাতুন হা/৫২২০ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায় 'ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

ব্যক্তিগত নীতি-আদর্শ ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিধিবিধানসহ তার ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ব্যবহারিক বিষয়েও ইসলাম চিরস্থায়ী হেদায়াত পেশ করেছে। অতএব ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা একারণে যে, যাতে পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে ইসলামী বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সহজ হয় এবং মানব কল্যাণ নিশ্চিত হয়।।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুসলমান তার ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম পালনে স্বাধীন থাকলেও বৈষয়িক জীবনে অনৈসলামী আইনে শাসিত হয়। সূদ-ঘুষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি কিংবা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সমাজবাদী অর্থনীতি অনুসরণের ফলে মুমিনের রূযী হারাম রূযীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে দেশের আদালতগুলিতে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা না থাকায় মানবরচিত আইনে মুমিনকে জেল-ফাঁসি বরণ করতে হয়। ফলে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবিচার, অশান্তি ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা ব্যাপকতা লাভ করে। এ সকল কারণে একজন মুমিনকে সর্বদা নিজ দেশে ও বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় তৎপর থাকতে হয়। কারণ ইসলামী খেলাফত শুধু মুসলমানের জন্য নয়, বরং খেলাফতের অধীনে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। ইসলামকে যেমন কোন একটি দল বা সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট হিসাবে গণ্য করা ঠিক নয়, ইসলামী খেলাফতকেও তেমনি নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের জন্য গণ্য করা ঠিক নয়। বরং আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ প্রেরিত বিধান সার্বজনীন, যা দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য মঙ্গলময় ও সকলের প্রতি সমানভাবে প্রয়োগ যোগ্য। যেমন আল্লাহ্র সৃষ্ট আলো-বাতাস, মাটি ও পানি সবার জন্য কল্যাণময়।

মুলূকিয়াত, জমহূরিয়াত ও খেলাফত

রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও খেলাফত তিনটি পরিভাষার মধ্যে তিনটি আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে। রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর হাতেই থাকে সার্বভৌমত্বের চাবিকাঠি। গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। খেলাফতে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। আল্লাহ্ই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস।

রাজতন্ত্রে রাজা নিজ বাহুবলে রাজ্য জয় করেন ও নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্য শাসন ও পরিচালনা করেন। রাজা সৎ, যোগ্য ও সুশাসক হ'লে রাজ্যে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। এমনকি রাজা ইসলামপন্থী হ'লে তাঁর দ্বারা ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করাও অসম্ভব কিছু নয়। বিগত দিনে এমনকি বর্তমান বিশ্বেও এর নযীর বিদ্যমান রয়েছে। এর বিপরীতটা হ'লে বিপরীত হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও বর্তমান বিশ্বে কোন রাজাই একক ইচ্ছায় দেশ চালান না। সর্বত্রই রয়েছে একটা নির্বাচিত অথবা মনোনীত মন্ত্রণাপরিষদ। যাই-ই হৌক না কেন সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক যেহেতু রাজা বা রাণীরূপে একজন ব্যক্তির হাতে থাকে, সেকারণ এই শাসন ব্যবস্থা আদর্শিক ভাবে ইসলামের সাথে সংঘর্ষশীল।

গণতন্ত্রে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দেশ শাসন করে। সংখ্যালঘু দল বা দলগুলি বিরোধী দল হিসাবে গণ্য হয়। তাদের সম্মিলিতভাবে প্রাপ্ত ভোট যদি সংখ্যাগুরু দলের প্রাপ্ত ভোটের চাইতে বেশীও হয়, তথাপি তারা দেশ শাসনের অনুমতি পায় না। ফলে গণতন্ত্রের নামে অধিকাংশ দেশেই চলে সংখ্যালঘুর শাসন। জনগণের নামে সেখানে চলে দলীয় শাসন। একটি দলের কিংবা দলনেতা বা নেত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে প্রতিনিয়ত মিথ্যাচার করা হয়। তাছাড়া প্রতি চার, পাঁচ বা ছয় বছর অন্তর নেতৃত্বের পরিবর্তনের ফলে এইসব দেশে অযোগ্য ও অদক্ষ নেতৃত্বের বিস্তার ঘটে। তাছাড়া নেতৃত্বের জন্য কোনরূপ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মানদণ্ড নির্ধারিত না থাকায় যেকোন ব্যক্তি নেতৃত্বের লোভী হয়ে যদৃচ্ছ আচরণ করে। যার প্রত্যক্ষ ফলভোগ করে সাধারণ জনগণ। এই সব দেশে সরকারী দল ও বিরোধী দলের লড়াই-সংঘর্ষ, হরতাল, সন্ত্রাস প্রতিপক্ষকে জব্দ করার মানসিকতা সর্বদা বিরাজ করে। ফলে সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিগণ অসম্মানিত হন। যোগ্য ব্যক্তিগণ অবমূল্যায়িত হন। দলীয়করণ প্রকট রূপ ধারণ করে। নির্দলীয় বা অপর দলীয় গুণী ও যোগ্য ব্যক্তির খেদমত থেকে প্রশাসন ও জনগণ বঞ্চিত হয়। ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বক্তা ও রাজনৈতিক নেতাদের কদর বেশী হওয়ার কারণে প্রচারবিমুখ যোগ্য, গুণী ও আল্লাহভীরু সৎ লোকদের উপস্থিতি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে খুবই কম দেখা যায়। ফলে সৎ ও আল্লাহভীরু যোগ্য নেতৃত্ব থেকে দেশ বঞ্চিত হয়। সর্বোপরি জনমতের কোন স্থিরতা না

থাকায় এবং সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থে বা বুঝের কমবেশীর কারণে ঘন ঘন জনমতের পরিবর্তন হওয়ায় গণতান্ত্রিক সংবিধান কখনোই জনকল্যাণের স্থায়ী কোন বিধান নয়। তাছাড়া গণতন্ত্রে জনগণের অংশীদারিত্বের কথা বলা হ'লেও কেবল ভোটের সময় ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে জনমতের কোনরূপ তোয়াক্কা করা হয় না। ফলে অসন্তুষ্ট জনগণ হরতাল, মিটিং-মিছিল, অনশন, গালি-গালাজ, হত্যা, লুণ্ঠন ও ভাঙচুরের পথ বেছে নেয়। এইভাবে গণতন্ত্র অবশেষে ঝগড়াতন্ত্র ও বন্দুকতন্ত্রে পরিণত হয়। যার পরিণাম ফল প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই এখন লোকেরা হাঁড়ে হাঁড়ে উপলব্ধি করছে। বর্তমানে ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ভোটকেন্দ্র দখলের জন্য সশস্ত্র ক্যাডার, চাঁদাবাজ ও ভাড়াটিয়া মস্তানদের কদর বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে ব্যাপক ঘুষ ও কালো টাকার ছড়াছড়ি। ফলে বর্তমান যুগে গণতন্ত্র জনমত প্রতিফলনের বাহন নয়। বরং এটা সন্ত্রাসী ও কালো টাকার মালিকদের নেতৃত্বে বসানোর বাহনে পরিণত হয়েছে মাত্র।

'খেলাফত' হ'ল আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী পরিচালনার জন্য আল্লাহ নির্ধারিত পথে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শাসনব্যবস্থার নাম। এই শাসনব্যবস্থায় আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আল্লাহ্‌র বিধান চূড়ান্ত ও চিরন্তন। খলীফা বা আমীর ও তাঁর মজলিসে শূরা এবং পূরা প্রশাসনযন্ত্র আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের বাস্তবায়নকারী মাত্র।

খেলাফত হ'তে মুলূকিয়াত (?)

হযরত মু'আবিয়া (নবুঅতপূর্ব ৫ম-৬০হিঃ/৬০৫-৬৮১ খৃঃ)-এর হাতে খেলাফত সমর্পণের অর্থ ইসলামী 'খেলাফতে'র সুউচ্চ মিনার থেকে 'মুলূকিয়াত' তথা রাজতন্ত্রের অন্ধকার গলিতে পতন নয়, যেমন অনেকে ধারণা করেন। বরং এটি ছিল খেলাফতের আসনে কেবল ব্যক্তির পরিবর্তন। নইলে রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও আইন-কানূন তাই-ই বহাল ছিল, যা পূর্ববর্তী খলীফাগণের সময়ে ছিল। বরং তাঁর খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয় উন্নতি আরও বেশী হয়েছিল।

জানা আবশ্যক যে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) রাসূলের প্রিয়তম ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশ্বস্ত ছয়জন 'অহি' লেখকের অন্যতম ছিলেন। হযরত

ওমরের যুগ থেকে একাদিক্রমে ২০ বছর সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন। পরে খলীফা হিসাবে আরও ২০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তাঁর তাক্বওয়া, সততা, আমানতদারী, শাসনদক্ষতা, দূরদর্শিতা নিঃসন্দেহে অনেকের চেয়ে বেশী ছিল। তিনি কখনোই আল্লাহ্র আইনের বাইরে নিজের আইন চালু করেননি। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে বাতিল করে রাজার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেননি। অতএব 'আমীরুল মুমেনীন' হিসাবে তিনি পূর্বসুরীদের ন্যায় নিঃসন্দেহে 'খলীফা' ছিলেন।[১০] প্রচলিত অর্থে কখনোই 'রাজা' বা 'সম্রাট' ছিলেন না। তবে তাঁর সময়কার খেলাফতের আয়তন পূর্ববর্তী খলীফাগণের তুলনায় বড় ছিল বিধায় সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও বেশী ছিল। নবুঅতের বরকত থেকে এ যুগ অনেক দূরে ছিল। যা আবুবকর ও ওমরের যুগ থেকে নিঃসন্দেহে নিম্নতর ছিল। যেমন এক সময় জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, مَابَالُ الْمُسْلِمِيْنَ اخْتَلَفُوْا عَلَيْكَ وَلَمْ يَخْتَلِفُوْا عَلَى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ؟ 'আপনার সময়ে মুসলমানদের কি হ'ল যে, তারা আপনার বিরুদ্ধে বিরোধ করছে। অথচ আবুবকর ও ওমরের সময় এরূপ করেনি। জবাবে আলী (রাঃ) বললেন, لِأَنَّ أَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا وَالِيَيْنِ عَلَى مِثْلِىْ وَأَنَا الْيَوْمَ وَالٍ عَلَى مِثْلِكَ، يُشِيْرُ إِلَى وَازِعِ الدِّيْنِ- 'এটা এজন্য যে, আবুবকর ও ওমর আমার মত লোকদের উপরে খলীফা ছিলেন। পক্ষান্তরে আমি খলীফা হয়েছি তোমার মত লোকদের উপরে'। ইবনু খালদূন বলেন, এর দ্বারা তিনি তাঁর সময়কার মানুষের মধ্যে দ্বীনী দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেন।[১১]

অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইয়াযীদ (২৭-৬৪হিঃ)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনয়ন দেওয়াকে গুরুতর অন্যায় বলে গণ্য করেন এবং এখান থেকেই ইসলামে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণায় পিতার পরে পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়াটাই রাজতন্ত্রের বড় আলামত। অথচ হযরত আলী (রাঃ)-এর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান (রাঃ) যখন খলীফা হলেন, তখন কিন্তু এটাকে কেউ রাজতন্ত্র বলেনি। হাসান

---

১০. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ইবনুল আরাবী, আল-আওয়াছেম মিনাল ক্বাওয়াছেম (রিয়াযঃ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ২০০, ২০৭-২১০।*

১১. *দ্রঃ মুক্বাদ্দামা ইবনু খালদূন (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুল আ'লমী, তাবি) ৩০শ অধ্যায়, পৃঃ ২১১।*

(রাঃ) স্বেচ্ছায় খেলাফত ত্যাগ করলে পরে মু'আবিয়া (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হন। অনুরূপভাবে ইয়াযীদের স্বল্পকালীন (৬০-৬৪হিঃ) খেলাফতের পরে তার পুত্র মু'আবিয়া খলীফা হ'লেও তিনি স্বেচ্ছায় খেলাফত ত্যাগ করলে এবং অন্যকে তার স্থলাভিষিক্ত না করলে মারওয়ান খলীফা হন। যিনি তার রক্ত সম্পর্কীয় ছিলেন না। অথচ আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের দেশগুলিতে আমরা দেখছি জাপান ও বৃটেন যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় তাদের সম্রাট ও রাণীকে মহা সম্মান ও মর্যাদায় রাষ্ট্রীয় খরচে লালন করে যাচ্ছে। গণতন্ত্রী দেশ ভারতে ও বাংলাদেশে পারিবারিক শাসন চলছে বিগত কয়েক যুগ ধরে।

পাকিস্তানে ১৯৬৪-এর নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে অনভিজ্ঞ ও অশীতিপর বৃদ্ধা মহিলা মিস ফাতিমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড় করিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী দলগুলির সাথে একই কাতারে থেকে তাঁকে ইসলামপন্থী অনেক দলের সমর্থন দানের পিছনে সম্ভবতঃ একটাই যুক্তি ছিল যে, মিস ফাতিমা হ'লেন পাকিস্তানের জনক মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌র বোন। অতএব জিন্নাহ্‌র বোন হওয়ার সুবাদে মিস ফাতিমাকে সবাই সমর্থন করবে। যদি এটাই যুক্তি হয়, তাহ'লে এটা রাজতন্ত্রী চিন্তাধারা নয় কি?

আলী-মু'আবিয়া (রাঃ) দ্বন্দ্বের প্রকৃতি

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব কখনোই খেলাফত দখলের দ্বন্দ্ব ছিল না। বরং তা ছিল হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবীতে সৃষ্ট দু'টি দলের ইজতিহাদী দ্বন্দ্ব। একদল চেয়েছিলেন সর্বাগ্রে ওছমানের রক্তের বদলা নেওয়া হৌক এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী ছাহাবীগণ ইত্যবসরে রাজধানীতে সমবেত হয়ে খলীফা নির্বাচন করুন। হযরত ত্বালহা, যোবায়ের, সা'দ, সাঈদ প্রমুখ আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ্‌র চারজন সহ মু'আবিয়া, আয়েশা, আমর ইবনুল আছ, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের প্রমুখ ছাহাবীগণ এই দলে ছিলেন। অন্যদলের দাবী ছিল সর্বাগ্রে খলীফা নির্বাচন হৌক। আপোষে বিরোধের এই সুযোগটি কাজে লাগিয়েছিল বাহ্যিকভাবে নও মুসলিম ইহুদী-খৃষ্টান কুচক্রীরা। ফলে সংঘটিত হয় উটের যুদ্ধ, ছিফফীনের যুদ্ধ প্রভৃতি। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপক।

শী'আ ও খারেজীদের বিপরীতমুখী দুই চরমপন্থী আক্বীদার বাইরে আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যপন্থী আক্বীদা হ'ল এই যে, ছাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকের বিষয়ে আমাদের এই সুধারণা পোষণ করতে হবে যে, তাঁরা কখনোই দুনিয়া লোভী ছিলেন না। তারা কখনোই ক্ষমতার মোহে পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হননি। তাঁরা স্ব স্ব ইজতিহাদ বা রায় মোতাবেক কাজ করেছেন। যাতে ভুল ও শুদ্ধ দু'টিই হবার অবকাশ ছিল।[১২]

ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করার কারণঃ

অতঃপর মু'আবিয়া (রাঃ) কেন স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন, তার প্রধানতম কারণ ছিল ইসলামী খেলাফতকে টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁচানো। দ্বিতীয়তঃ ইয়াযীদের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) ব্যতীত সকল ছাহাবীর একমত হওয়া। তৃতীয়তঃ ঐ সময় সমাজে প্রভাব বিস্তারকারী বনু উমাইয়াগণ ইয়াযীদ ব্যতীত অন্য কারু ব্যাপারে রাযী না হওয়া।[১৩]

অধিকন্তু ইয়াযীদকে স্থলভিষিক্ত করার ব্যাপারে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব ছিল না। বরং তৎকালীন সময়কার টাল-মাটাল রাজনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় ছাহাবীগণের পক্ষ থেকেই প্রস্তাব এসেছিল। যাদের মুখপাত্র হিসাবে এটি পেশ করেছিলেন, খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ)। নইলে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ওমর ফারূকের অনুকরণে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে দিয়ে একটি প্যানেল করে দিতে চেয়েছিলেন। যাদের মধ্য থেকে একজনকে লোকেরা খলীফা হিসাবে বেছে নিবে। তারা হলেনঃ (১) সাঈদ ইবনুল 'আছ (২) আবদুল্লাহ বিন 'আমের (৩) হযরত হুসায়েন (৪) মারওয়ান (৫) আবদুল্লাহ বিন ওমর (৬) আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের। কিন্তু নাযুক রাজনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় প্রবীণ ছাহাবী হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) তাঁকে ইয়াযীদের ব্যাপারে পরামর্শ দেন। প্রথমে ইতস্ততঃ করলেও পরে তিনি এতে একমত হন।[১৪] ইয়াযীদের নিঃসন্দেহে যোগ্যতা ছিল। নইলে উম্মতের সেরা ব্যক্তিবর্গ তাঁকে খলীফা হিসাবে প্রস্তাবও

---

১২. *ইবনু খালদূন, মুক্বাদ্দামা ২৮শ অধ্যায়, পৃঃ ২০৫।*
১৩. *ইবনু খালদূন, মুক্বাদ্দামা ৩০শ অধ্যায়, পৃঃ ২১০-২১১।*
১৪. *আল-বিদায়াহ-এর বরাতে 'খেলাফত ও মুলূকিয়াতঃ একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পর্যালোচনা' পৃঃ ৪০৩।*

করতেন না বা মেনেও নিতেন না। আর বাপের স্থলে যোগ্য ছেলে নেতা হওয়ায় শরী'আতে কোন বাধাও ছিল না। যাহাবী বলেন, আমরা ইয়াযীদকে গালিও দেব না, ভালো, বাসবো না। খলীফাদের মধ্যে তাঁর চাইতে নিম্নস্তরের অনেকে ছিলেন'।[১৫] মূলতঃ শী'আদের একদেশদর্শী লেখনী দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বহু ঐতিহাসিক ইয়াযীদকে কদর্যভাবে চিত্রিত করেছেন, যা প্রকৃত অবস্থা হ'তে অনেক দূরে। ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। তাঁর এ পদক্ষেপ ছিল স্রেফ উম্মতে মুহাম্মাদীর সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় ও তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিবেচনায়। ইয়াযীদের নাম ঘোষণার পরে মু'আবিয়া (রাঃ) জনসমক্ষে যে ভাষণ দেন, সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সবকিছু জানো। হে আল্লাহ! যদি আমি তাকে এজন্য স্থলাভিষিক্ত করে থাকি যে, সে যথার্থভাবেই এর যোগ্য, তাহ'লে তুমি তাকে পূর্ণ সফলতা দান কর। আর যদি এর মধ্যে আমার পুত্র স্নেহের আতিশয্য কার্যকর থাকে, তাহ'লে তুমি তোমার সাহায্যের হাত গুটিয়ে নাও। তুমি তাকে সফল হতে দিয়ো না'।[১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ! যদি ইয়াযীদকে তার যোগ্যতা ও গুণাবলীর কারণে আমি স্থলাভিষিক্ত করে থাকি, তাহ'লে তুমি তাকে সেই স্থানে পৌঁছে দাও, যার আমি আশা করি এবং তাকে সাহায্য কর। আর যদি এর পিছনে আমার পুত্রস্নেহ একান্ত কারণ হয়ে থাকে, তাহ'লে খলীফা হওয়ার পূর্বেই তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও'।[১৭]

অতএব উম্মতের বুযর্গ ছাহাবীগণের প্রতি সুধারণা রেখেই আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত। বিশেষ করে মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাছ দো'আ রয়েছে, اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে সঠিক পথ প্রদর্শনকারী ও সঠিক পথের অনুসারী কর এবং তার মাধ্যমে লোকদের সঠিক পথ প্রদর্শন কর'।[১৮] অতএব তখনকার পরিস্থিতিতে সার্বিক বিবেচনায় তিনি যে ইয়াযীদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন, তা সঠিক কাজই করেছিলেন বলে আমাদের ধারণা রাখতে হবে।

---

১৫. *সিয়ার, (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ ৩য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ৪/৩৬ পৃঃ।*
১৬. *আল-বিদায়াহ-এর বরাতে 'খেলাফত ও মুলূকিয়াতঃ একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পর্যালোচনা' পৃঃ ৪১৫।*
১৭. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ২/২৬৭-এর বরাতে পূর্বোক্ত পৃঃ ৪১৫*
১৮. *তিরমিযী, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬২৩৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৯৮৪ 'সমষ্টিগত ভাবে ফযীলতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*

রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও খেলাফতের মধ্যকার পার্থক্যঃ

(১) রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দু'টিই মানবরচিত মতবাদ। পক্ষান্তরে 'খেলাফত' আল্লাহ্র অনুমোদিত শাসন ব্যবস্থার নাম।

(২) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে এক বা একাধিক মানুষের হাতেই থাকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকানা। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং বান্দা মালিকের প্রতিনিধি মাত্র।

(৩) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে মানব রচিত বিধান অনুযায়ী দেশ শাসিত হয়। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী দেশ শাসিত হয়।

(৪) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে মানুষ মানুষের গোলামী করে। পক্ষান্তরে খেলাফতে মানুষ কেবল আল্লাহ্র গোলামী করে।

(৫) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে মানুষের রচিত আইন সদা পরিবর্তনশীল। পক্ষান্তরে খেলাফতে অনুসৃত আল্লাহ্র আইন অপরিবর্তনীয়।

(৬) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে হালাল-হারামের মালিক জনগণ। পক্ষান্তরে খেলাফতে উক্ত মালিকানা স্রেফ আল্লাহ্র হাতে।

(৭) রাজতন্ত্রে 'রাজা' এবং গণতন্ত্রে 'দলনেতা' সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। পক্ষান্তরে খলীফা বা আমীরের ক্ষমতা আল্লাহ্র আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত।

(৮) রাজতন্ত্রে রাজার নাবালক এমনকি অযোগ্য পুত্র-কন্যাগণ রাজা হ'তে পারে। অনুরূপভাবে গণতন্ত্রে দলীয় প্রভাবে অযোগ্য, অসৎ ও অদক্ষ লোক নেতা নির্বাচিত হ'তে পারে। কিন্তু ইসলামী খেলাফতে সৎ ও যোগ্য নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে শরী'আত নির্ধারিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে সৎ ও আল্লাহভীরু যোগ্য ব্যক্তিই কেবল খলীফা বা আমীর নির্বাচিত হ'তে পারেন এবং শূরা সদস্য মনোনীত হ'তে পারেন।

(৯) রাজা কারুর নিকটে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। অন্যদিকে দলীয় প্রধানমন্ত্রী বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী জাতীয় সংসদে জওয়াবদিহীতার নামে নিজ দলের এম,পি-দের হাততালি কুড়ান এবং বিরোধী দলের বাক্যবাণে আরও স্বেচ্ছাচারী ও প্রতিশোধকামী হয়ে ওঠেন। পক্ষান্তরে খলীফা বা আমীর আল্লাহভীরু শূরা

সদস্যদের নিকটে পরামর্শ আহ্বান করেন এবং তাঁরাও ইসলামী আদব রক্ষা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁকে 'হক' পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

(১০) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে ব্যক্তি ইচ্ছা বা দলীয় ইচ্ছাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহ্র ইচ্ছাই প্রধান বিষয়। এমনকি কুরআন বা ছহীহ হাদীছের দলীল থাকলে 'আমীর' শূরা সদস্যদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারেন। যেমন আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) উসামা বিন যায়েদকে জিহাদে প্রেরণের সময় এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সময় করেছিলেন।

(১১) রাজতন্ত্রে রাজাগণ আমৃত্যু এবং গণতন্ত্রে দলনেতা বা এম,পি-গণ মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত নিজেদের শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও তাদের স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু খেলাফত ব্যবস্থায় খলীফা ও কর্মকর্তাগণের কার্যকালের মেয়াদ তাদের স্ব স্ব তাক্বওয়া ও যোগ্যতা থাকা প´ন্ত সীমায়িত।

(১২) রাজতন্ত্রে রাজাদেশই চূড়ান্ত। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত'। ফলে হকপন্থী একক ব্যক্তি বা সংখ্যালঘুর রায় সঠিক হ'লেও তা অনেক সময় বিবেচনায় আনা হয় না। পক্ষান্তরে ইসলামে অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। সেকারণ এখানে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু সবারই ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

(১৩) রাজতন্ত্রে রাজা হওয়ার চেষ্টা চলে এবং গণতন্ত্রে ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। পক্ষান্তরে 'খেলাফত' ব্যবস্থায় পদ ও ক্ষমতা দখলের আকাংখা ও প্রচেষ্টা দু'টিই নিষিদ্ধ।

'খেলাফত' প্রতিষ্ঠার উপায়

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায় হ'ল দু'টিঃ দাওয়াত ও জিহাদ। প্রথমোক্তটির মাধ্যমে 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হবে। তাদের চিন্তাধারায় বিপ্লব আনতে হবে। কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে ও সেই সাথে যাবতীয় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজ দেশ ও বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াত পেশ করতে হবে। যেন ইসলামী খেলাফতের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে মানব জাতির সকল স্তরে স্পষ্ট ধারণা ও মঙ্গল চেতনা

সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়টির জন্য ব্যাপক বস্তুগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এজন্য ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে প্রথমে সীসাঢালা সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে হবে। এটাই হবে জিহাদের সর্বপ্রধান হাতিয়ার। সমাজের প্রতিটি স্তরে, গ্রামে ও মহল্লায় যখন একদল সচেতন আল্লাহভীরু ও যোগ্য মুজাহিদ তৈরী হয়ে যাবেন এবং স্রেফ আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবেন। তখন সংখ্যায় যত নগণ্যই হৌক না কেন, আল্লাহ্র সাহায্যে তারাই জয়লাভ করবেন। এভাবে সাংগঠনিক শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে এমনকি তিনজন মুমিন একস্থানে থাকলেও তাদেরকে একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য হাদীছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৯] এই ইমারতের মাধ্যমে সুশৃংখলভাবে দেশব্যাপী দাওয়াত ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই ধরনের সাংগঠনিক ও জিহাদী ইমারতের পথ বেয়েই একদিন জাতীয় ভিত্তিক 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। যদিও পূর্ণাঙ্গ 'ইসলামী খেলাফত' কেবলমাত্র ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাবের পরেই সম্ভব হবে।

সূরায়ে নূর-এর আলোচ্য ৫৫ 'আয়াতে ইস্তিখলাফে' 'ঈমান' ও 'আমলে ছালেহ'-কে 'খেলাফত' প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর নিরংকুশভাবে ও শিরক বিমুক্ত ভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রকে ত্বাগূতের আনুগত্যমুক্ত করে ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ্র আনুগত্যের অধীন করলেই তবে পৃথিবীতে যেমন আল্লাহ্র রহমতে 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠিত হবে, আখেরাতেও তেমনি আল্লাহ্র নিকটে জান্নাত লাভের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

আয়াতের শেষে খেলাফত লাভকে গুরুত্বপূর্ণ নে'মত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং যে ব্যক্তি এই নে'মত লাভের পরেও তার না-শুকরী করে, তাকে ফাসেক্ব বলা হয়েছে। পরের আয়াতে ছালাত কায়েমের মাধ্যমে জাতির নৈতিক শক্তি, যাকাত কায়েমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শক্তি এবং সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখার মাধ্যমে আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহকে তাই তাদের হারানো

---

১৯. *আহমাদ, হা/৬৬৪৭; ছহীহ আবুদাউদ হা/২২৭২; নায়ল, 'আক্বযিয়াহ ও আহকাম' অধ্যায় ১০/২৪৩ পৃঃ।*

খেলাফত পুনরুদ্ধারে সর্বদা সচেষ্ট থাকা যরূরী। নইলে সারা জীবন ইহুদী-খৃষ্টান ও কুফরী শক্তির গোলামী করেই মানবেতর জীবন কাটাতে হবে, যেমন খেলাফতহারা মুসলমানকে এখন কাটাতে হচ্ছে।

সংশয় নিরসনঃ

'জিহাদ' বলতে অনেকে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ বুঝাতে চান। অথচ হাদীছে জান, মাল ও যবান দ্বারা জিহাদ করতে বলা হয়েছে।[২০] প্রথম যুগে ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার জন্য যখনই কুফরী শক্তি অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখনই ইসলামের ইতিহাসে বদর, ওহোদ, খন্দকের জিহাদী ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। নইলে ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনের প্রথম ১৪ বছর স্রেফ দাওয়াতের মধ্যেই কেটেছে। আজও যদি কুফরী শক্তি অস্ত্র নিয়ে ইসলামী দেশের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপরে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ 'ফরযে আয়েন' হবে। যেভাবে কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, আফগানিস্তান, ইরাক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কুফরী শক্তিকে মুকাবিলা করা হচ্ছে। কিন্তু শান্ত অবস্থায় দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গী তৎপরতা চালানো, বিদ্রোহ করা বা বিদ্রোহের উস্কানী দেওয়া, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যতক্ষণ তারা ছালাত কায়েম করে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِّنْ مَّعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَايَأْتِي مِنْ مَّعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ- সাবধান! তোমাদের শাসকের কোন গোনাহের কাজ দেখলে ঐ কাজটিকে অপসন্দ কর। কিন্তু তার থেকে অবশ্যই আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিয়ো না'।[২১] বলা হয়েছে, أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ، 'তাদের পাওনা তাদের দাও এবং তোমাদের পাওনা আল্লাহ্র নিকটে চাও'।[২২] তবে যদি সরকার ইসলাম বিরোধী আইন মানতে চাপ সৃষ্টি করে, তখন তা মানা যাবে না।[২৩] কোন

---

২০. আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৮২১।
২১. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭০ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।
২২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৭২।
২৩. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬।

মুসলমান যখন অমুসলিম দেশে বসবাস করবে, তখন সে দেশের সরকারের কাছ থেকে নিজেদের ধর্মীয় অধিকার আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে চেষ্টা করবে। না পারলে ছবর করবে ও আল্লাহ্র নিকটে এর বদলা কামনা করবে।

পক্ষান্তরে মুসলিম দেশে বাস করেও কোন মুসলিম সরকার যদি ইসলামী বিধান মোতাবেক দেশ শাসন না করে, তবে উক্ত সরকারকে যেমন সৎ পরামর্শ দিতে হবে ও নছীহত করতে হবে, তেমনি সাধারণ জনগণকে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার পক্ষে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করে তুলতে হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হেদায়াত নিম্নরূপঃ

عَنْ أُمٍّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَ تُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَ لَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَ تَابَعَ قَالُوْا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ مَاصَلَّوْا، لاَ مَاصَلَّوْا-
‘তোমাদের মধ্যে অনেক আমীর হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, কোন কাজ মন্দ মনে করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি ঐ কাজকে অপসন্দ করবে, সেও নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসারী হবে। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি তখন ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে’।[২৪] এ সময় শাসকদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে খাছ দো‘আ করার নির্দেশ হাদীছে এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও পথভ্রষ্ট দাউস গোত্রের ও তাদের নেতার হেদায়াতের জন্য দো‘আ করেছিলেন।[২৫]

---

২৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১, ‘নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা’ অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৭/২৩৩ পৃঃ।
২৫. বুখারী ২/৬৩০ পৃঃ।

দ্বিতীয় ভাগ

নেতৃত্ব নির্বাচন

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِهَا، وَإِذَاحَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط اِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ط اِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝ يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ أَطِيْعُوا اللّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَآ أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ؛ وَقَدْ أُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيْدًا ۝

অনুবাদঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন এ বিষয়ে যে, তোমরা আমানত সমূহ যথাযোগ্য স্থানে সমর্পণ কর। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-ফায়ছালা করবে, তখন ন্যায় বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে সুন্দরতম উপদেশ দান করে থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা *(নিসা ৫৮)*। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর আমার রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদ কর, তাহ'লে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপরে বিশ্বাসী হও। আর এটাই (তোমাদের জন্য) কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম *(৫৯)*। আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা ধারণা করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, সবকিছুর উপরে তারা ঈমান এনেছে। অথচ তারা তাদের বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের কাছে নিয়ে যেতে চায়। যদিও তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা ওকে প্রত্যাখ্যান করে। আর

শয়তান তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করতে চায়' *(নিসা ৬০)*।

ব্যাখ্যাঃ সূরা নিসা-র উপরোক্ত তিনটি আয়াতে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব যথাযোগ্য স্থানে অর্পণ, নেতৃত্ব নির্বাচন ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং সকল বিরোধীয় বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ও কোন অবস্থাতেই শয়তানের অনুসরণ না করার জন্য মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম আয়াতে 'আমানাত' শব্দটিকে বহুবচন আনা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, শুধু বস্তুগত কোন আমানত নয় বরং জীবন ও সমাজ পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে যখনই যে দায়িত্ব ন্যস্ত হবে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্র আমানত। নিয়োগ ও বরখাস্তের মালিক সকল নেতা ও কর্মকর্তা উক্ত আমানতের যিম্মাদার। কাজেই উক্ত আমানত যেমন কোন অযোগ্য ব্যক্তির নিকটে সমর্পণ করা যাবে না। তেমনি প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তি তালাশ করা নেতার জন্য অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ সমাজ পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য নেতা বাছাই করার পন্থা কি?

নেতৃত্ব নির্বাচনের পন্থা সমূহ

নেতৃত্ব বাছাই বা নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য এযাবৎ চারটি পন্থা দেখা গেছে। যথা- অছিয়ত বা নামকরণ ভিত্তিক, পরামর্শভিত্তিক, রাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক।

প্রথমোক্ত পন্থায় পূর্বতন নেতা স্বীয় পসন্দমত পরবর্তী নেতার নাম বলে যান, যা সকলে মেনে নেন।

দ্বিতীয় পন্থায় পূর্বতন নেতা যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে নিজে পরামর্শ করেন ও সে ভিত্তিতে একজনকে নেতা নির্বাচন করে দেন অথবা একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করে দেন, যারা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের নিকট থেকে মতামত গ্রহণ করেন ও সে ভিত্তিতে উক্ত কমিটি পরবর্তীতে নেতা নির্বাচন করেন।

তৃতীয় পন্থায় রাজা স্বীয় সন্তানদের মধ্যে যাকে যোগ্য মনে করেন, তাকে পরবর্তী 'রাজা' হিসাবে ঘোষণা করেন, যা অন্যেরা মেনে নেন।

চতুর্থ পন্থায় পূর্বতন নেতার কোন ভূমিকা থাকে না। বরং প্রাপ্ত বয়স্ক প্রজাসাধারণের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে একটি দল

বা কখনো কখনো একজন নেতা নির্বাচিত হ'য়ে থাকেন। তবে বহুদলীয় গণতন্ত্রে সরাসরি নেতা নির্বাচিত হন না। বরং দলের মনোনীত বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হন এবং তারাই দলনেতাকে দেশের নেতা নির্বাচিত করেন, যদি দলনেতা নিজে নির্বাচিত হ'তে পারেন। শেষোক্ত পন্থায় অনেকগুলি দল নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পরাজিত দল সমূহের প্রাপ্ত সম্মিলিত সমর্থন যদি বিজয়ী দলের চাইতে বেশীও হয়, তথাপি অন্য দলসমূহের প্রাপ্ত পৃথক পৃথক সমর্থনের তুলনায় বিজয়ী সংখ্যালঘু দলটির নেতাই দেশের নেতা হ'য়ে থাকেন। বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই নিয়মে নেতৃত্ব নির্বাচন চলছে। শুধু দেশের নেতাই নন বরং স্থানীয় সংস্থা সমূহে এমনকি মসজিদ-মাদরাসার কমিটি গঠনেও এই নিয়ম চালু হয়েছে। শোষোক্ত পন্থায় নেতা নির্বাচনের মূল দায়িত্ব থাকে সাধারণ জনগণের হাতে। ফলে জনগণের আবেগ-অনুভূতিকে সুযোগ মত কাজে লাগানোই থাকে দলনেতাদের প্রধান কাজ।

নেতৃত্বের গুরুত্ব

সমাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত সমূহের মধ্যে অন্যতম সেরা নে'মত হ'ল নেতৃত্বের যোগ্যতা। এই যোগ্যতা ও গুণ সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যেই আল্লাহ দিয়ে থাকেন। বাকীরা তাদের অনুসরণ করেন। তবে নবী ব্যতিত অন্য নেতাদেরকে আল্লাহ পাক সরাসরি নিয়োগ করেন না। বরং বান্দাদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে যোগ্য নেতা বাছাইয়ের জন্য। যদিও নেতা আল্লাহ প্রদত্ত তার নিজস্ব গুণ ও যোগ্যতা বলেই অন্যদের থেকে স্পষ্ট হ'য়ে যান। তবুও নেতৃত্ব যেহেতু চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয়, সেহেতু অন্যদেরকেই নেতৃত্ব বাছাই করে তাকে তা অর্পণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরে তার পিছনে একটি জামা'আত কায়েম হবে। এই জামা'আত তার নেতার পিছনে আনুগত্যশীল ও ঐক্যবদ্ধ থাকবে। যে জামা'আত তার নেতার প্রতি যত বেশী শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত, সে জামা'আত তত বেশী শক্তিশালী ও সংহত। ইসলামী জামা'আতের স্তম্ভ হ'ল তিনটিঃ আমীর, মা'মূর ও ইত্বা'আত অর্থাৎ আদেশদাতা, আদেশ মান্যকারী ও আনুগত্যশীলতা। এ তিনটি স্তম্ভের কোন একটি না থাকলে জামা'আত ধ্বংস হয় এবং সাথে সাথে জামা'আতী শক্তি ও মর্যাদা বিলুপ্ত হয়।

নেতৃত্বের গুরুত্ব গাড়ীর ড্রাইভারের মত বা বিমানের ক্যাপ্টেনের মত। যাকে একই সঙ্গে যেমন যোগ্য ও সদা-সতর্ক থাকতে হয়, তেমনি সর্বতোভাবে যিম্মাদার হ'তে হয়। যে সমাজে যত যোগ্য নেতার সমাবেশ ঘটবে, সে সমাজ তত দ্রুত অগ্রগতি লাভ করবে। নেতৃত্ব নির্বাচনের গুরুত্ব ইসলামে সবচাইতে বেশী। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল খলীফা নির্বাচন। আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) মৃত্যুর সময় এটাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ওমর ফারূক (রাঃ) যখমে কাতর অবস্থায় এটাকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়টি কোন হেলা-খেলার বস্তু নয় যে, যার তার হাতে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়।

নেতৃত্ব নির্বাচন ফরয না সুন্নাত?

ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব নির্বাচন 'ফরয'। তবে 'ফরযে আয়েন' নয়, বরং 'ফরযে কেফায়াহ'। উম্মতের দায়িত্বশীল কিছু গুণী ব্যক্তি যখন পূর্বতন নেতার পরে সৎ ও যোগ্য কাউকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করে নেন, তখন সকলের পক্ষ থেকে উক্ত ফরয আদায় হ'য়ে যায় এবং সকলকে তা মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়। এটা 'ফরযে আয়েন' নয় যে, উম্মতের প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ সবাইকে এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতেই হবে।

নির্বাচক কারা হবেন?

নেতৃত্ব নির্বাচনের মত ফরয হক আদায়ের কঠিন যিম্মাদারী ইসলাম গুণী-নির্গুণ, সৎ-অসৎ, যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে সকলের উপরে ন্যস্ত করেনি। বরং এই দায়িত্বের প্রধান হকদার ও যিম্মাদার হ'লেন পূর্বতন নেতা। যিনি এযাবত নেতৃত্বের বোঝা বহন করে আসছেন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে উম্মতের কল্যাণ চিন্তা করে তিনি যাকে মনস্থ করবেন, তিনিই নেতা হবেন। যেমন হযরত আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে করে গিয়েছিলেন এবং রাসূলে করীম (ছাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন ও পরবর্তীতে ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বায়'আতের মাধ্যমে যা কার্যকর হয়।[১]

---

১. ওমর (রাঃ) সহ ঐ সময় সেখানে মাত্র পাঁচজন ছাহাবী উপস্থিত ছিলেন। ওমর (রাঃ)-এর পরপরই বাকী চারজন বায়'আত করেন। অতঃপর মদীনাবাসীগণ বায়'আত করেন। উক্ত চারজন হ'লেন, আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ, উসায়েদ বিন হুযায়ের, বিশ্‌র বিন সা'দ ও আবু হুযায়ফার গোলাম সালেম। আল-আহকাম, পৃঃ ৭।

অমনিভাবে হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করে নিলে বাকী সকলে তাঁর প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নেন।

যদি পূর্বতন নেতা কোন একক ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে যোগ্য মনে না করেন, তবে তিনি সকলের মধ্যে যোগ্যতর একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিবেন। যারা অনধিক তিনদিনের মধ্যে বা যথাসম্ভব দ্রুত সময়ে একজনকে আবশ্যিকভাবে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবেন ও পরে জনগণের সমর্থন নিবেন। এ পদ্ধতি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) গ্রহণ করেছিলেন।

যদি উম্মতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কোন একজন বা একাধিক ব্যক্তি পূর্বতন নেতার সৎ ও যোগ্য পুত্রকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে সেটাও গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) মাত্র একজন ব্যক্তি হযরত ক্বায়েস বিন সা'দ (রাঃ)-এর বায়'আতের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সকলে তা মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকূলে স্বেচ্ছায় খেলাফত ত্যাগ করলে মু'আবিয়া (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হন।

এক্ষণে যদি পূর্বতন নেতা কাউকে অছিয়ত বা মনোনয়ন না দিয়ে যান। কিংবা কোন প্যানেল না দিয়ে যান, সে অবস্থায় তার সময়ের মজলিসে শূরার সদস্যগণ একত্রে পরামর্শের মাধ্যম পরবর্তী খলীফা বা আমীর নির্বাচন করবেন। শূরা সদস্যগণকে জাতির পক্ষ থেকে যেকোন মূল্যে এ গুরুদায়িত্ব পালন করতেই হবে। কারণ তাঁরাই হ'লেন মূল নির্বাচক। ঝামেলার অজুহাতে অন্যের হাতে ছেড়ে দিলে ফিৎনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। যা আল্লাহ্র কাম্য নয়।

নির্বাচকের যোগ্যতা ও গুণাবলী

জনগণের মধ্যে সর্বদা দু'টি দল পরিলক্ষিত হয়। একদল নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন (أَهْلُ الْإِمَامَةِ) এবং একদল অনুসারী ও নেতৃত্ব বাছাইকারী (أَهْلُ الْإِخْتِيَارِ)। নেতৃত্ব বাছাইয়ের জন্য নিরপেক্ষ, সৎ ও দূরদর্শী নির্বাচক মণ্ডলী অবশ্য প্রয়োজন। কেননা স্বার্থপর, অসৎ ও অদূরদর্শী ব্যক্তি কখনোই সৎ ও যোগ্য নেতা বাছাইয়ের গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারে না। রাষ্ট্রনীতি বিশারদ পণ্ডিত আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী (মৃঃ ৪৫০ হিঃ) নির্বাচকের জন্য প্রধান তিনটি গুণ বর্ণনা করেছেনঃ (১) ন্যায়নিষ্ঠা (الْعَدَالَةُ) যেখানে কোনরূপ

অন্যায় ও সংকীর্ণতা স্থান পাবেনা (২) জ্ঞান (العِلْمُ) অর্থাৎ সম্ভাব্য নেতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা এই মর্মে যে, তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের শর্তাবলী পূর্ণভাবে মওজুদ রয়েছে (৩) দূরদর্শিতা ও রায় দানের ক্ষমতা (الرَّأْىُ وَالْحِكْمَةُ) এই মর্মে যে, কে নেতৃত্বের জন্য সর্বাধিক অগ্রগণ্য ও দক্ষতা সম্পন্ন।

নেতৃত্বের জন্য উপরোক্ত তিনটি গুণের সাথে তিনি আরও চারটি গুণ তিনি যোগ করেছেনঃ (১) কান, চোখ ও জিহ্বা ঠিক থাকার মাধ্যমে দৈহিক অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায় বহাল থাকা (২) দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা (৩) বীরত্ব ও সাহসিকতা। যাতে বিরোধী পক্ষের সাথে জিহাদ ও মোকাবিলায় তিনি যোগ্য প্রমাণিত হন (৪) কুরায়শী হওয়া। যদিও এটি সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয়।[২] তবে কুরআনের মৌলিক নির্দেশ অনুযায়ী শূরা সদস্যদের প্রত্যেককে তাক্বওয়াশীল হওয়া অপরিহার্য *(হুজুরাত ১৩)*। কোন অবস্থাতেই তাঁরা দ্বীন ও তাক্বওয়া হাত ছাড়া করতে পারবেন না।

নেতৃত্ব দান ও নেতৃত্ব বাছাই দু'টিই বড় কঠিন বিষয়। ইসলাম এ দু'টিকে সুশৃংখলভাবে সমাজ পরিচালনার স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আর এজন্যেই মুসলমানদের তিনজন একস্থানে থাকলেও তাদের মধ্যে একজনকে 'আমীর' নিয়োগ করতে বলা হয়েছে।[৩] এমনকি একটি রাত ও একটি সকালও আমীর বিহীন জীবনযাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪]

আনুগত্যের গুরুত্ব

নেতৃত্বের সাথে ওৎপ্রোতভাবে আনুগত্যের বিষয়টি গুরুত্ব জড়িত। নেতা ফেরেশতা নন। অনেক সময় নেতার অনেক সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হবে কিংবা অপসন্দনীয় হবে। এমনকি কর্মীর চাইতে নেতা নিম্নমানের হবেন।

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً-

---

২. *আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বাছরী আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলত্বা-নিইয়াহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) পৃঃ ৬।*

৩. *আহমাদ হা/৬৬৪৭, ১০/১৩৪ পৃঃ; হাকেম ১/৪৪৩, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৯১১; ছাহীহাহ হা/১৩২২।*

৪. *ইবনু আসাকির, ফাতাওয়া ওলামায়ে কেরাম (করাচী) পৃঃ ১০, ৪৩।*

'যখন কেউ তার আমীরের কাছ থেকে অপসন্দনীয় কোন আচরণ দেখবে, তখন সে যেন ছবর করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমাণ পৃথক হয়ে মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[৫]

(২) অন্য হাদীছে এসেছে, তোমরা নেতার আদেশ শোন এবং তা পালন কর, যদিও নেতা হাবশী গোলাম হন বা নাক-কান কাটা হন। কিন্তু আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী নির্দেশ দেন'।[৬]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ، وَمَنْ يُّطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَّعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِى، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِه وَيُتَّقَى بِه، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ (متفق عليه)-

'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল। আমীর হ'লেন ঢাল স্বরূপ। যাঁর পিছনে থেকে লড়াই করা হয় ও যাঁর মাধ্যমে নিজেকে বাঁচানো হয়। যদি আমীর আল্লাহ ভীতির নির্দেশ দেন ও ন্যায় বিচার করেন, তাহ'লে এর বিনিময়ে তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন। আর যদি বিপরীত কিছু বলেন, তাহ'লে তার গোনাহ তার উপরেই বর্তাবে'।[৭]

(৪) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَحُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه مسلم)-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের প্রতি আনুগত্যের

---

৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৮ 'ইমারত' অধ্যায়।
৬. বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৬৩।
৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬১; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৭/২২৫-২৬ পৃঃ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।

হাত ছিনিয়ে নিল, সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে এমন অবস্থায় যে, তার জন্য (ওযর স্বরূপ) কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে আমীরের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[৮]

(৫) আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ-

(১) 'তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর (২) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর (৩) রামাযানের ছিয়াম পালন কর (৪) যাকাত আদায় কর (৫) আমীরের আনুগত্য কর, তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর'।[৯] অত্র হাদীছে আমীরের আনুগত্যকে ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং একে জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই আমীরের আনুগত্যের গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে।

উক্ত 'ইমারত' শারঈ ইমারত হ'তে পারে বা রাষ্ট্রীয় ইমারত হ'তে পারে। কিংবা দু'টিই একত্রে হ'তে পারে। সকল পর্যায়ের আমীরের প্রতি বায়'আত ও আনুগত্য করা যরূরী। শারঈ বা সাংগঠনিক আমীর 'হদ' জারি করবেন না বা জিহাদ ঘোষণা করবেন না। কেননা এ দায়িত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় আমীরের জন্য নির্দিষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে শারঈ আমীর ছিলেন। তখন তাঁর প্রতি 'হদ' জারি করার নির্দেশ আসেনি। অতঃপর মাদানী জীবনে রাষ্ট্রীয় আমীর হন। তখন তাঁর উপরে 'হদ' জারি করার ও 'জিহাদ' ঘোষণা করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু উভয় অবস্থায় তাঁর বায়'আত ও আনুগত্য উম্মতের উপরে ফরয ছিল। অতএব সর্বাবস্থায় একজন শারঈ আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। ইসলামী রাষ্ট্র থাক বা না থাক, সেটা কোন শর্ত নয়।

আমীর 'কুরায়শী' হওয়াও শর্ত নয়। সেকারণ ইমাম মাওয়ার্দী বলেন, 'উত্তম ব্যক্তি পাওয়া সত্ত্বেও অনুত্তম ব্যক্তিকে আমীর নিয়োগ করা যাবে, যদি তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের শর্তাবলী পাওয়া যায়'।[১০] কেননা নির্বাচকদের জন্য উত্তম গুণাবলীর

---

৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৭/২৩৪ পৃঃ।
৯. ছহীহ তিরমিযী, হা/৫০২ 'ছালাত' অধ্যায়ের সর্বশেষ হাদীছ।
১০. আল-আহকাম পৃঃ ৯।

অধিক প্রয়োজন এবং নেতা হওয়ার জন্য অধিক প্রয়োজন হ'ল যোগ্যতার। যদি কোন স্থানে একজনের মধ্যেই গুণাবলী ও যোগ্যতার উভয় শর্ত পাওয়া যায়, তাহ'লে তাঁর নিকটেই নেতৃত্ব রেখে দিতে হবে। অন্যত্র দেওয়া যাবে না। যেমন যোগ্যতা ও গুণাবলী অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত একজন বিচারপতিকে তাঁর বিচারাসন থেকে সরানো যায় না, অনুরূপভাবে সৎ ও যোগ্য নেতাকেও তাঁর নেতৃত্ব থেকে সরানো জায়েয নয়' (ঐ)। ফলে মেয়াদ ভিত্তিক নেতা নির্বাচনের বিষয়টি ইসলামে আবশ্যিক নয়। নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য লটারী করাও জায়েয নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন ঠাণ্ডা মাথায় নিরপেক্ষ ও দূরদর্শী চিন্তাধারার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সেকারণ নেতা আবশ্যক বিবেচনা করলে নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচক মণ্ডলী নিয়োগ করবেন। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) মুসলিম উম্মাহ্‌র নেতা নির্বাচনের জন্য মৃত্যুর পূর্বে আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ্‌র ছয়জনকে বাছাই করে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য। এ দায়িত্ব তিনি সাধারণ জনগণকে দেননি। কারণ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা যেকোন ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

নেতৃত্ব নির্বাচনের শূরা পদ্ধতি

ইবনু ইসহাক্ব ইমাম যুহরী থেকে এবং যুহরী ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, একদা আমি ওমর ফারূক (রাঃ)-কে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলাম। এমতাবস্থায় আমাকে তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না কাকে আমি খেলাফতের এ গুরু দায়িত্ব অর্পণ করব। আমি একবার দাঁড়াচ্ছি একবার বসছি। তখন আমি তাঁকে বললামঃ আলী সম্পর্কে আপনার আগ্রহ আছে কি? তিনি বললেন, তাঁর যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু তিনি হাসি-ঠাট্টা মেযাজের মানুষ। তবে তাঁর উপরে খেলাফতের ভার অর্পণ করলে আমি মনে করি যে, তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথে চালাতে সক্ষম হবেন। আমি বললামঃ ওছমান সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, যদি আমি এটা করি তাহ'লে ইবনু আবী মু'ঈত্ব লোকদের ঘাড় মটকাবে। লোকেরা তখন তার দিকে না তাকিয়ে ওছমানকেই হত্যা করবে।

আমি বললামঃ ত্বালহা সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, তিনি একটু আত্মম্ভরী মেযাজের মানুষ। এটা জানা সত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব তার উপরে চাপানোটা আল্লাহ পসন্দ করবেন না। আমি বললাম যুবায়ের সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, উনি একজন বীরপুরুষ। কিন্তু উনি তো

মদীনার বাজারে ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তিনি কিভাবে মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ের দিকে নযর দিবেন? আমি বললাম, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, উনি দ্রুত রেগে ওঠেন। ওনার বিরুদ্ধে লড়াই হ'তে পারে। বললাম, আব্দুর রহমান বিন 'আওফ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কতই না সুন্দর মানুষটির কথা তুমি বললে! কিন্তু উনি বড়ই দুর্বল। আল্লাহ্র কসম! হে আব্দুল্লাহ! এই নেতৃত্বের জন্য এমন একজন ব্যক্তি প্রয়োজন, যিনি শক্তিশালী কিন্তু অত্যাচারী নন। যিনি নম্র কিন্তু দুর্বল নন। যিনি হিসেবী কিন্তু কৃপণ নন। যিনি দাতা কিন্তু অপচয়কারী নন'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর যখন আবু লুলু তাঁকে আহত করল ও ডাক্তারগণ তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং লোকেরা তাঁকে পরবর্তী খলীফা নিয়োগের জন্য বলতে লাগল, তখন তিনি উক্ত ছয়জনকে নিয়ে একটি 'শূরা' গঠন করে দিলেন এবং আলী-এর সঙ্গে যুবায়ের, ওছমানের সঙ্গে আবদুর রহমান বিন 'আওফ এবং ত্বালহার সঙ্গে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-কে জোড়া বানিয়ে দিলেন।[১১] এঁদের মধ্যে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-কে জুড়ে দিলেন পরামর্শদাতা হিসাবে, নেতৃত্বের হক্বদার হিসাবে নয়।[১২]

অতঃপর ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আবদুর রহমান বিন 'আওফ বাকী পাঁচজনকে ডেকে বললেন, আপনারা নেতৃত্বকে তিনজনের মধ্যে সীমিত করে দিন। তখন যুবায়ের স্বীয় নেতৃত্বকে আলীর উপরে, ত্বালহা ওছমানের উপরে এবং সা'দ আবদুর রহমান বিন 'আওফের উপরে ন্যস্ত করলেন। এক্ষণে বিষয়টি তিনজনের মধ্যে সীমিত হ'য়ে গেল। তখন আবদুর রহমান বিন 'আওফ, হযরত আলী ও ওছমান (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্যে যিনি নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবেন, আমরা এটা তাঁর উপরেই ন্যস্ত করব। আল্লাহ তার উপরে সাক্ষী থাকবেন। এতে কেউ কোন জবাব দিলেন না। তখন আবদুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) বললেন, আপনারা কি নেতৃত্ব আমার উপরে ন্যস্ত করতে চান? অথচ এটা থেকে আমি নিজেকে বের করে নিয়েছি। আল্লাহ আমার উপরে সাক্ষী আছেন। তবে আপনারা কি নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়টি আমার উপরে ছেড়ে দিতে চান? আল্লাহ্র কসম আমি আপনাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে বাছাই করতে কার্পণ্য করব না। তখন তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ (এতে আমরা রাযী)।[১৩]

---

১১. *আল-আহকাম পৃঃ ১৩।* ১২. *বুখারী ১/৫২৪ 'মানাক্বিব' অধ্যায়, 'ওছমানের বায়'আত' অনুচ্ছেদ।*

১৩. *বুখারী ১/৫২৫; আবদুর রহমান কীলানী, খেলাফত ও জামহূরিয়াত (লাহোর, মাজলিসুত তাহক্বীক্বিল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৯৮৫) পৃঃ ৬৫-৬৬।*

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আপনারা চাইলে আমি আপনাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করতে পারি। তখন তাঁরা তাঁকে এখতিয়ার দেন।[১৪] এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমি বাদে আপনি কাকে খেলাফতের যোগ্য মনে করেন? তিনি বলেন, ওছমানকে। পৃথকভাবে একই প্রশ্নে ওছমান (রাঃ) সমর্থন করেন আলীকে'। এর ফলে নেতৃত্ব দু'জনের মধ্যে সীমিত হ'য়ে গেল। অতঃপর আবদুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) বের হ'লেন লোকদের মতামত যাচাইয়ের জন্য। নির্ধারিত তিনদিন তিন রাতের মধ্যে তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করে ব্যাপকভাবে জনমত যাচাই করেন। মুক্বীম-মুসাফির, দলবদ্ধ লোকজন বা একাকী এমনকি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও পর্দার অন্তরালে মা-বোনদের কাছ থেকেও মতামত শ্রবণ করেন। কিন্তু কেবলমাত্র 'আম্মার ও মিক্বদাদ (রাঃ) ব্যতীত সকলের নিকট থেকেই তিনি ওছমান (রাঃ)-এর পক্ষে সমর্থন পান। এভাবে তিনি যাকে পরামর্শের যোগ্য মনে করেন তার কাছ থেকেই পরামর্শ নেন এবং বাকী সময়টা ছালাত, দো'আ ও ইস্তেখারার মধ্যে অতিবাহিত করেন। তিন রাত তিনি খুব কমই ঘুমিয়েছেন'।[১৫]

খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে ওমর ফারূক (রাঃ) কয়েকটি নিয়ম করে গিয়েছিলেন। যেমন- (১) তিনদিন তিন রাতের মেয়াদ বেঁধে দিয়েছিলেন (২) স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহকে (স্রেফ রায় দেওয়ার জন্য, খেলাফত গ্রহণের জন্য নয়) উক্ত শূরার সাথে যুক্ত করে দেন। 'যদি তিন তিন সমভাগ হয়ে যায়, সে অবস্থায় আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর রায় চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে'।[১৬]

(৩) মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)-কে এই হুকুম দিয়ে যান যে, এই ছয়জন ব্যক্তি যতক্ষণ না একজনকে খলীফা নির্বাচন করবেন, ততক্ষণ তুমি কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিবে না। সেমতে হযরত মিক্বদাদ ও আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ) পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনদিনের জন্য ছুহায়েব (রাঃ)-কে মসজিদে নববীর ইমাম নিয়োগ করেন এবং নিজে ৫০ জনের একটি দল নিয়ে মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাঃ) বা কারু মতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহের দরওয়াযায় পাহারা দিতে থাকেন। যাতে কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে না পারেন আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ব্যতীত।।

---

১৪. বুখারী ২/১০৭০ 'আহকাম' অধ্যায়, 'কিভাবে লোকেরা আমীরের বায়'আত নেবে' অনুচ্ছেদ।
১৫. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৭/১৫১; খিলাফত পৃঃ ৬৭-৬৮।
১৬. আবদুর রহমান আবদুল খালেক্ব, আশ-শূরা ফী যিল্লি নিযা-মিল হুকমিল ইসলামী (কুয়েতঃ দার সালাফিইয়াহ ২য় সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮) পৃঃ ১১৪।

কেননা ঐ গৃহে তখন শূরার সদস্যগণ নেতৃত্ব নির্বাচনের আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। তিনদিন পরে ফজরের সময় যখন আবদুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) মসজিদে নববীতে এলেন খলীফার নাম ঘোষণা করার জন্য, তার পূর্বে তিনি দু'জনের নিকট থেকে ওয়াদা নেন যে, যার হাতেই বায়'আত করা হবে, তিনি আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত-এর উপরে আমল করবেন এবং তিনি যার হাতেই বায়'আত করবেন, অন্যজন তার আনুগত্য করবেন।[১৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি প্রথমে যুবায়ের ও সা'দকে ডেকে এনে পরামর্শ করেন। অতঃপর আলীকে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে বলেন, আমি যদি আপনাকে খলীফা নির্বাচন করি, তাহ'লে আপনি ন্যায় বিচার করবেন এবং যদি ওছমানকে নির্বাচন করি, তাহ'লে আপনি তাঁর আনুগত্য করবেন। এরপর ওছমান (রাঃ)-এর কাছ থেকেও তিনি পৃথকভাবে অনুরূপ ওয়াদা নেন।

এরপর তিনি মসজিদে নববীতে উভয়কে সাথে নিয়ে আসেন ও রাসূলের মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে (হাম্দ ও ছানা শেষে সংক্ষিপ্ত ভাষণের পরে) ওছমান (রাঃ)-এর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে তিনবার বলেন, اَللَّهُمَّ اسْمَعْ وَاشْهَدْ، اَللَّهُمَّ اسْمَعْ وَاشْهَدْ، اَللَّهُمَّ اسْمَعْ وَاشْهَدْ، إِنِّىْ قَدْ خَلَعْتُ مَافِىْ رَقْبَتِىْ مِنْ ذَلِكَ فِىْ رَقْبَةِ عُثْمَانَ، 'হে আল্লাহ! তুমি শোন ও সাক্ষী থাকো (তিনবার)। হে আল্লাহ! আমার স্কন্ধে যে বোঝা ছিল, তা আমি ওছমানের স্কন্ধে সমর্পণ করলাম'। অতঃপর তিনি মিম্বরের সর্বোচ্চ স্তরে বসেন ও ওছমানকে ২য় স্তরে বসান। অতঃপর প্রথমে হযরত আলী (রাঃ) বায়'আত করেন। এরপর উপস্থিত মদীনাবাসী মুহাজির, আনছার, সেনাপতিবৃন্দ ও জনগণ দলে দলে বায়'আত করতে থাকেন'। খলীফা হওয়ার পরে ওছমান (রাঃ) আছরের জামা'আতে ইমামতি করেন। অতঃপর জনসমক্ষে প্রথম ভাষণ দেন।[১৮]

সার-সংক্ষেপ

উপরোক্ত ঘটনার সার-সংক্ষেপ ও শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) নেতৃত্ব নির্বাচন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (২) নেতৃত্ব যেকোন ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না (৩) নির্বাচকদের আবেগমুক্ত ও নিরপেক্ষ এবং

---

১৭. আল-বিদায়াহ ৭/১৫২, খিলাফত পৃঃ ৬৯।
১৮. বুখারী ২/১০৭০; আল-বিদায়াহ ৭/১৫২, খিলাফত পৃঃ ৬৪-৬৫।

নেতার চাইতেও জ্ঞানী হওয়া আবশ্যক (৪) নির্বাচক এমনকি এক ব্যক্তিও হ'তে পারেন (৫) নির্বাচনের জন্য আবশ্যক বোধে সকল পর্যায়ের লোকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে (৬) নির্বাচকের রায়ই চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে (৭) অন্য সবাইকে তা মেনে নিতে হবে (৮) শূরা সদস্যদের সংখ্যা স্বল্প ও সীমিত হবে (৯) নির্বাচক ও নির্বাচিত উভয়ে শূরার অন্তর্ভুক্ত হবেন (১০) নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া যাবে না (১১) ইচ্ছার বিরুদ্ধে হ'লেও ঘোষিত নেতৃত্বকে মেনে নিতে হবে ও প্রথমেই শূরা সদস্যদেরকে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নিতে হবে (১২) শূরা সদস্যদের 'বায়'আতে খাছ' গ্রহণ করতে হবে। শেষোক্ত 'বায়'আতে 'আম' প্রথমোক্ত বায়'আতকে সমর্থন করবে মাত্র। কেননা নেতৃত্ব বাছাইয়ে অন্যদের সরাসরি কোন ভূমিকা নেই।

ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতিঃ তুলনামূলক আলোচনা

প্রচলিত চারটি নির্বাচন পদ্ধতির প্রথম দু'টির সাথে ইসলামের সম্পর্ক স্বাভাবিক। তৃতীয়টিতে যদি বাদশাহ কোন দ্বীনদার যোগ্য ব্যক্তিকে পরবর্তী বাদশাহ নিয়োগ করেন, তাহ'লে ইসলাম তাকে সমর্থন দেয়। যেমন হযরত আবুবকর (রাঃ) করেছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-কে এবং ওমর (রাঃ)-এর মনোনীত শূরার মাধ্যমে হযরত ওছমান (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। যেমন উমাইয়া খলীফা সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক (৯৬-৯৯হিঃ/৭১৫-৭১৭খৃঃ) স্বীয় ভাতিজা ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করেছিলেন। হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ) পিতার পরে পুত্র উভয়ে পৃথিবীর বাদশাহ ছিলেন।[১৯] যদি নেতৃত্ব নিয়ে আপোষে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে সে অবস্থায় উম্মতের কোন সেরা ব্যক্তি একজনকে নেতা হিসাবে নির্বাচন করলে তাকেই সকলে মেনে নিবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে প্রথমে খেলাফতের বায়'আত করেন। তখন সকলেই তা মেনে নেন।

উল্লেখ্য যে, রাসূলের মৃত্যুর সময় আরব উপদ্বীপে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০ লাখের কাছাকাছি এবং ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় ইসলামী খেলাফতের আয়তন ছিল ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাযার) বর্গমাইল।[২০] অথচ নেতৃত্ব নির্বাচন হয়েছিল কেবলমাত্র মদীনার দারুল খেলাফতে উপস্থিত সেরা মনীষী

১৯. বাক্বারাহ ২৫১, ছোয়াদ ৩৫। *২০, খেলাফত পৃঃ ৯২, ৮৬।*

বৃন্দের মাধ্যমে। অন্যদের এতে কোন ভূমিকা ছিল না।

মোট কথা যোগ্য নেতা নির্বাচনের জন্য যোগ্য নির্বাচক প্রয়োজন। যেটা উপরে বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভব। পূর্বতন নেতা যেকোন একটি গ্রহণ করতে পারেন। ইবনে হাযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬হিঃ) বলেন, প্রথমোক্ত পন্থাই আমাদের নিকটে সবচেয়ে উত্তম। কেননা এর ফলে উম্মতের ঐক্য ও সমাজের শৃংখলা বজায় থাকে। অন্য পন্থাগুলিতে উম্মতের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং নেতৃত্বের লোভ বাপকভাবে মাথা চাড়া দেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে'।[২১]

গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি ও ইসলাম

পূর্বে বর্ণিত চারটি নির্বাচন পদ্ধতির চতুর্থটি অর্থাৎ আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৎ ও যোগ্য নেতা নির্বাচিত হওয়া এবং তার মাধ্যমে ইসলামী বিধান কায়েম হওয়া সম্ভব কি-না এবং ইসলামে এ পদ্ধতির অনুমোদন আছে কি-না এক্ষণে আমরা তা খতিয়ে দেখব।

ইসলামপন্থী দলগুলো সাধারণভাবে এই সুধারণা পোষণ করে থাকে যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যতীত যেহেতু ইসলামী বিধান পূর্ণভাবে কায়েম হওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার বাছাই করা সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হবে। অতঃপর তারা নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসদে এসে ইসলামী বিধি-বিধান জারি করার ব্যবস্থা করবেন। চিন্তাটি বড়ই সাধু। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই নিষ্করুণ। কেননা শুধু ইসলাম কেন কোন আদর্শভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাই প্রচলিত প্রথায় জনগণের সার্বজনীন ভোটাভুটির মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বরং এটাই বাস্তব কথা যে, নবীগণ পৃথিবীর সেরা মানুষ হ'লেও তাঁরা কখনোই স্ব স্ব যুগের অধিকাংশ মানুষের সমর্থন পাননি। তাই আজও অধিকাংশ মানুষের সমর্থনে সৎ ও যোগ্য লোকের নেতা নির্বাচিত হওয়া কষ্টকল্পনা বৈ কিছুই নয়।

যদি মনে করা হয় যে, নির্বাচক ও নির্বাচন প্রার্থী উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলী নির্ধারণ করে দিলে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব বাছাই হয়ে আসবে। যেমন উভয়ে চোর, গুণ্ডা, সন্ত্রাসী, দাগী আসামী, ঋণখেলাপী, চোরাচালানী, ঘুষখোর ও

২১. *কিতাবুল ফাছল ফিল মিলাল (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ২য় সংস্করণ ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খৃঃ) ৩/৯৭ পৃঃ।*

বেঈমান হবে না। বরং উভয়কেই সৎ ও যোগ্য, ঈমানদার, আমানতদার ও মুত্তাক্বী হ'তে হবে ইত্যাদি। তবুও সঠিক নেতৃত্ব আসবেনা। কারণ সবাই নিজেকে নেতা হবার যোগ্য মনে করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তার অধিকার রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। আর এই ধারণা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক যুগে নেতৃত্বের মেয়াদ প্রথা। যাতে প্রতি ৪/৫ বছর অন্তর নতুন নতুন নেতা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ আসে। আর ঐ সুযোগ পাওয়ার জন্য সকলের মধ্যেই সৃষ্টি হয় নেতৃত্ব পাওয়ার লোভ, যা তাকে পাগল করে ফেলে পরবর্তী নেতা হবার জন্য। আর এর জন্য হেন অপরাধ নেই যা সে প্রকাশ্যে বা গোপনে করে না।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যক্তিগত কুফল

(১) সে দু'হাতে নিজের বা দলের টাকা খরচ করে (২) সে নিজের গুণগান করে ও প্রতিপক্ষের চরিত্র হননে ব্যস্ত হয়ে পড়ে (৩) সে সমাজ ও সরকারের দুষ্টমতি লোকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, যাতে সমাজের অধিকাংশ দুনিয়াদার, অদূরদর্শী ও হুজুগে লোকদের ভোট লাভ করতে পারে (৪) ভোটের সংখ্যাধিক্য হারজিতের মানদণ্ড হওয়ার কারণে সে যেকোন মূল্যে একটি ভোট হ'লেও তা বৃদ্ধির চেষ্টা করে ও যেকোন অপকৌশল ও নোংরা পন্থা অবলম্বন করে বা করতে বাধ্য হয় (৫) নেতা হওয়ার অধিকার তারও আছে, এটা প্রকাশ করার জন্য সে প্রথমে মনোনয়ন প্রার্থী হয় ও যথারীতি মনোনয়নপত্র জমা দেয়। অতঃপর নিজে বা দলীয় কর্মীগণ সর্বত্র মিটিং-মিছিল করে, পোষ্টার-বিজ্ঞাপন বিতরণ করে। বাড়ী বাড়ী গিয়ে দো'আ চাওয়ার নামে ভোট ভিক্ষা করে। এইভাবে নিজের বা দলের হাযার হাযার টাকা সে পানির মত খরচ করে। যার অধিকাংশই অপচয় ছাড়া কিছু নয়। যদি সে ভোটে হেরে যায়। তাহ'লে সব হারায়। আর যদি জিতে যায়, তাহ'লে তার প্রথম লক্ষ্য হয় ব্যয়কৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের পথ বের করা। এর জন্য যেকোন অপকৌশলের আশ্রয় নিতে সে পরোয়া করে না। এগুলি হ'ল প্রচলিত নির্বাচন প্রথার ব্যক্তিগত কুফল। এক্ষণে এর সামাজিক কুফল আমরা অবলোকন করব।-

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সামাজিক কুফল

(১) যেহেতু নিজের বা দলীয় তহবিল ব্যতীত প্রচলিত নির্বাচনী যুদ্ধে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু জাতীয় সংসদে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুঁজিপতিদের আধিপত্য কায়েম হয়। ফলে গরীবদের ভোট নিয়ে ধনীরাই সংসদ দখল করে

এবং সমাজের সর্বত্র তারা অর্থনৈতিক শোষণ পাকাপোক্ত করার সুযোগ লাভ করে। ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের সঞ্চিত অর্থ দেশের মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হাতে বন্দী হয়ে পড়ে। ব্যাংক ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ের নামে তারা যেমন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। তেমনি ঋণখেলাপী হ'য়ে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করে। এদের বিরুদ্ধে সরকারের কার্যকরভাবে কিছুই করার থাকে না। কেননা এদের কাছ থেকে মোটা অংকের তহবিল নিয়েই রাজনৈতিক দল সমূহ পরিচালিত হয়। তাই কি সরকারী দল কি বিরোধী দল সবাই এদের বিরুদ্ধে চুপটি মেরে থাকে। পাকিস্তান আমলে ২২ পরিবারের হাতে দেশের সকল সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছিল। আর বাংলাদেশ আমলে তা এখন ১৫৬ জনের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে এবং যার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। ফলে দেশের অর্থনীতি দিন দিন পঙ্গু হ'তে চলেছে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে কিছু সংখ্যক দলনেতা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল। অন্যদিকে হাযার হাযার বনু আদম না খেয়ে মরেছিল। আজও দেশ তেমনি অবস্থার শিকার হ'তে চলেছে। অথচ দেশে বিগত ৩৩ বছর যাবত গণতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে এবং জাতীয় সরকার থেকে উপযেলা ও গ্রাম সরকার পর্যন্ত ভোটাভুটির মাধ্যমে সর্বত্র নেতা নির্বাচিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। কিন্তু দেশ ও সমাজ ক্রমে রসাতলে যাচ্ছে।

(২) নির্বাচনী প্রথায় একাধিক ভোটপ্রার্থী থাকায় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি সৃষ্টি হয়। নির্বাচনের পরেও এই অবস্থা বর্তমান থাকে। যা সমাজে হিংসা-হানাহানি, এমনকি খুনাখুনি পর্যন্ত সৃষ্টি করে। অনেকের বিবি তালাকের ঘটনাও ঘটে। এভাবে সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট পারিবারিক ব্যবস্থা পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে (৩) বর্তমান নির্বাচনী প্রথায় সরকারী ও বিরোধী দল থাকায় তাদের মধ্যে দলীয় বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী হয়। যার প্রতিক্রিয়া সমাজের সর্বত্র দেখা দেয়। ফলে সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। শান্তি ও অগ্রগতি ব্যাহত ও বিপর্যস্ত হয় (৪) বহুদলীয় নির্বাচন প্রথায় অনেকগুলি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এমতাবস্থায় নির্বাচিত ব্যক্তি বা দলকে অন্য দল আন্তরিকভাবে সমর্থন করে না। ফলে সর্বদা পরস্পরে শত্রুতার পরিবেশ বজায় থাকে। যা সামাজিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে (৫) দলীয় নির্বাচন প্রথা দলীয় 'আছাবিয়াত' বা অহংবোধ সৃষ্টি করে। ব্যক্তির চেয়ে দল বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে সরকারী দল ভাল কাজ করলেও বিরোধী দল চোখ বুঁজে থাকে বা তার অপব্যাখ্যা করে (৬) প্রচলিত প্রথায় জাতীয় সংসদ সদস্যদেরকে স্ব স্ব এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়। নির্বাচিত হওয়ার অহংকারে তিনি সর্বদা স্ফীত থাকেন। তিনি অযোগ্য বা দুর্নীতিগ্রস্ত

হ'লেও দলনেতা বা সংসদ নেতা তাকে সরাতে পারেন না। ফলে পূর্ণ মেয়াদকাল অবধি জাতিকে এইসব এমপি নামধারী লোকদের বোঝা বইতে হয়। এলাকার প্রশাসনে ও জননিরাপত্তা বিধানে এদের আইনতঃ কোন ভূমিকা না থাকলেও জনপ্রতিনিধি হবার দোহাই দিয়ে এরা সর্বদা প্রশাসনের উপরে তাদের অবৈধ চাপ সৃষ্টি করে। ফলে সুষ্ঠু প্রশাসন অনেকসময় বিঘ্নিত হয় (৭) এই প্রথায় নেতা নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সুস্থিরভাবে কাজ করতে পারেন না। কেননা তাকে সর্বদা বিরোধী দলের তোপের মুখে থাকতে হয়। যা তার বা তার দলের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত করে। অন্যদিকে নিজ দলের স্বার্থশিকারী, দুর্নীতিবাজ নেতা ও সন্ত্রাসীদের কাছে দলনেতাকে কার্যতঃ যিম্মী হয়ে থাকতে হয়। ফলে সমাজে তার ব্যাপক মন্দ প্রভাব পড়ে (৮) এই ব্যবস্থায় সৎ-অসৎ, গুণী-নির্গুণ, নারী-পুরুষ সকলের ভোটের মূল্য সমান হওয়ায় 'হবু ও গবুর রাজ্যে তেল ও ঘিয়ের মূল্য সমান' হওয়ার ন্যায় সমাজে ছোট-বড় কোন ভেদাভেদ থাকে না। মানীর মান থাকে না। সৎ, যোগ্য ও গুণীজনের কদর থাকে না। তথাকথিত সাম্যের নামে মানুষের সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হয় (৯) এই ব্যবস্থায় মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিক অংশগ্রহণ করে থাকে ও যাকে খুশী তাকে নেতৃত্বে বসায় । অথচ মুসলিমগণ কেবলমাত্র ইসলামী বিধান মানতে বাধ্য। যা একজন ইসলামী নেতার মাধ্যমেই কেবল বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ফলে এই নির্বাচন ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে বাইরে রাখার খৃষ্টানী চক্রান্ত বৈ কিছুই নয়।

সবশেষে বলা চলে যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের সর্বত্র সামাজিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল প্রচলিত এই নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। কেন্দ্রে ও স্থানীয় সংস্থা সমূহের সর্বত্র এই নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সর্বত্র নেতৃত্বের লড়াই, পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি এবং সামাজিক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

শূরার গুরুত্ব ও পরিধি

সাংগঠনিক ইমারত হৌক বা রাষ্ট্রীয় ইমারত হৌক শূরার গুরুত্ব সবসময় বেশী। 'আমীর' তাঁর সাংগঠনিক বা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সর্বদা মজলিসে শূরা-র পরামর্শ নিবেন এটাই আল্লাহ্‌র হুকুম এবং এটাই হ'ল বৈষয়িক বিষয়সমূহে ইসলামের বুনিয়াদী মূলনীতি। যেমন-

(১) আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ– 'আল্লাহ্‌র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহ'লে তারা আপনার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আপনার কর্মকাণ্ডে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, তখন আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপরে ভরসাকারীদের ভালবাসেন *(আলে-ইমরান ১৫৯)*।

(২) মুমিনের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ– 'যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, ছালাত কায়েম করে, পারষ্পরিক পরামর্শ মতে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে' *(শূরা ৩৮)*।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বৈষয়িক ব্যাপার সমূহে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিতেন। যেমন মদীনায় হিজরত করার পরে লোকদের যখন দেখলেন যে, তারা পুং খেজুর গাছের কেশর মাদী খেজুর গাছের কেশরে লাগাচ্ছে, তখন তিনি এটাকে অপসন্দ করলেন। তখন লোকেরা এটা পরিত্যাগ করল। ফলে খেজুরের ফলন কমে গেল। তখন লোকেরা রাসূলের নিকটে গেলে তিনি বললেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ– 'আমি (তোমাদের মত) একজন মানুষ। আমি যখন দ্বীনী বিষয়ে তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তখন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যখন (বৈষয়িক ব্যাপারে) আমার নিজের মত অনুযায়ী কোন নির্দেশ দেই, তখন আমি একজন মানুষ মাত্র' (অতএব তাতে আমার ভুল হ'তে পারে)।[২২]

(৪) হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) ২৩ হিজরী সনে জীবনের শেষ হজ্জ পালন করার সময় মিনায় অবস্থানকালে লোকদের কিছু মন্তব্য তাঁর কানে আসে এই

---

২২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৪০, কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়িয়ে ধরা' অনুচ্ছেদ*।

মর্মে যে, ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যু হ'লে আমরা অমুকের হাতে খলীফা হিসাবে বায়'আত করব। কেননা আবুবকর (রাঃ) সামান্য কয়েকজন লোকের বায়'আতের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। একথা শুনে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। অতঃপর মদীনায় ফিরে এসে জুম'আর খুৎবায় দাঁড়িয়ে তিনি প্রথমে বিবাহিত যেনাকার নারী-পুরুষদের রজমের বিষয়ে বলেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পরে খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে ইতিপূর্বে শোনা কথার পুনরুক্তি করে বলেন, مَنْ بَايَعَ رَجُلاً مِّنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِىْ بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُّقْتَلاَ، 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে কাউকে খলীফা হিসাবে বায়'আত করল, তার বায়'আত সিদ্ধ হবে না। সে এবং তার হাতে বায়'আতকারী উভয়ে নিজেদেরকে কতলের শিকার বানিয়ে নিল'।[২৩]

ইবনু হাজার বলেন, এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে, খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তড়িঘড়ি না করার জন্য। কেননা আবুবকর (রাঃ)-এর মত সর্বগুণাবলী সম্পন্ন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব পাওয়া সর্বযুগে সম্ভব নয়'।[২৪]

উপরের দলীলসমূহ দ্বারা জাতীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক মতামত গ্রহণের ও সর্বস্তরে জনমত যাচাইয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিজেও বিভিন্ন জাতীয় সমস্যায় ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপক পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমীর নির্বাচনের জন্য শুধুমাত্র শূরা সদস্যদের রায়ই যথেষ্ট, না আম জনসাধারণের সমর্থন প্রয়োজন আছে। এর জবাব হ'ল এই যে, শূরা সদস্যগণকে অবশ্যই আম জনগণের সমর্থন যাচাই করতে হবে। যেমন ওছমান (রাঃ)-এর বেলায় করা হয়েছিল। জনসমর্থনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই শূরা সদস্যগণ আমীর নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নিবেন। যদি দু'জন সমান যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে একজনের প্রতি জনসমর্থন বেশী হয়, তাহ'লে শূরা সদস্যগণ তাঁকেই 'আমীর' ঘোষণা করবেন। তবে সর্বাবস্থায় 'আমীর' নির্বাচনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক হ'লেন শূরা সদস্যগণ। ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিজস্ব আমলই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

---

২৩. *বুখারী ২/১০০৯ পৃঃ।*
২৪. *ফাৎহুলবারী হা/৬৮৩০-এর ব্যাখ্যা 'হুদূদ' অধ্যায় ৩১ নং অনুচ্ছেদ, ১২/১৫৫ পৃঃ।*

এমনিভাবে যেসব বিষয়ে শরী'আতের স্পষ্ট বিধান মওজুদ রয়েছে, সেগুলি বাদে কোন ইজতিহাদী বিষয়ে যখন শূরার পরামর্শ গ্রহণ করা হবে, তখন আমীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিবেন। যেমন খন্দকের যুদ্ধের সময় গাত্বফান গোত্রের সাথে সন্ধির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেবলমাত্র দু'জন সা'দ অর্থাৎ আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয ও খাযরাজ নেতা সা'দ বিন 'ওবাদাহ (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করেন ও পরে নিজের মত পরিবর্তন করেন। জাতির সামগ্রিক স্বার্থের বিষয়ে তিনি সবার নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। যেমন বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধের সময়ে তিনি সবার নিকট থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। বিশেষ করে আনছারদের নিকট থেকে, যারা তাঁকে সাহায্য করার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে হিজরতের পূর্বে হজ্জের মৌসুমে মক্কায় তাঁর হাতে বায়'আত করেছিলেন। ওহোদের যুদ্ধে তিনি নিজের রায় বাদ দিয়ে যুবকদের ও অধিকাংশ মদীনাবাসীর রায় অনুযায়ী মদীনার বাইরে এসে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'শায়খান' অর্থাৎ হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ নিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দিতেন। এমনকি তিনি তাদেরকে বলতেন لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِىْ رَأْىٍ مَا خَالَفْتُكُمَا 'যদি তোমরা দু'জন কোন বিষয়ে একমত হও, তাহ'লে আমি তোমাদের বিরোধিতা করব না'।[২৫]

জনমত যাচাইয়ের অর্থ এটা নয় যে, 'আম' জনগণ সবাই শূরা সদস্য এবং তাদের সকলের সমর্থন, অনুমতি ও ঐক্যমত ব্যতীত 'আমীর' নির্বাচন বা যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না, যেমনটি ধারণা করেছেন আধুনিক যুগের কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ।[২৬] নিঃসন্দেহে সর্বদা শূরার গুরুত্ব সর্বাধিক। যেমন হযরত আলী (রাঃ)-কে খেলাফত গ্রহণের অনুরোধ করা হ'লে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, لَيْسَ هَذَا لَكُمْ إِنَّمَا هُوَ لِأَهْلِ بَدْرٍ وَ أَهْلِ الشُّوْرَى فَمَنْ رَضِىَ بِهِ أَهْلُ الشُّوْرَى وَ أَهْلُ بَدْرٍ فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ فَتَجْتَمِعُ وَ تَنْظُرُ فِىْ هَذَا الْأَمْرِ

---

২৫. আহমাদ ৪/২২৭; আশ-শূরা পৃঃ ৪।

২৬. أَهْلُ الشُّوْرَى هُمْ عُمُوْمُ النَّاسِ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ سَيَتَعَلَّقُ بِعُمُوْمِهِمْ كَاخْتِيَارِ الْخَلِيْفَةِ وَاِعْلَانِ الْحَرْبِ وَالْحَاكِمِ– দ্রঃ আশ-শূরা পৃঃ ১০১।

'এটা তোমাদের এখতিয়ার নয়। বরং এটি বদরী ছাহাবা ও শূরা সদস্যদের দায়িত্ব। তাঁরা একত্রে বসে যাকে মনোনীত করবেন, তিনিই খলীফা হবেন'।[২৭]

তবে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী 'আমীর' শূরা সদস্যগণের এবং প্রয়োজনে সকল স্তরের জনগণের মতামত ও সমর্থন যাচাই করবেন ও সেমতে সিদ্ধান্ত নিবেন। এভাবে পরামর্শ গ্রহণ শেষে আমীরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰه 'তুমি লোকদের পরামর্শ নাও। অতঃপর যখন স্থির প্রতিজ্ঞ হবে, তখন আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা কর' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

বর্তমান যুগে ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থা কিভাবে সম্ভব?

বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি স্তম্ভ হ'ল বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইনসভা বা জাতীয় সংসদ। এর মধ্যে বিচার ও শাসন বিভাগের প্রধান পদগুলি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হয়। প্রেসিডেন্ট দেশের প্রধান বিচারপতি মনোনয়ন দেন। অতঃপর তাঁর পরামর্শক্রমে অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ দান করেন। প্রধান সেনাপতি ও যেলা প্রশাসক সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ সমূহে তিনি নিয়োগ দেন। বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ ইত্যাদি তাঁর হাতেই রয়েছে। তিনি এসব ব্যাপারে অধঃস্তনদের সাথে পরামর্শ করেন। কিন্তু তাঁকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

বাকী থাকল পার্লামেন্ট বা আইনসভা। এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হন ও তারাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্টের নিকটে শপথ গ্রহণ করেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকেই সবচেয়ে শক্তিশালী নির্বাহী ক্ষমতা দান করা হয়েছে। ফলে তাঁর পরামর্শের বাইরে প্রেসিডেন্টের কিছু করার এমনকি বক্তৃতা করারও ক্ষমতা নেই। এটা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী প্রেসিডেন্ট-এর পদমর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার শামিল।

উপরের চিত্র সামনে রেখে বর্তমান সময়ে নিম্নোক্ত উপায়ে ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারেঃ

---

২৭. আশ-শূরা পৃঃ ১০৩।

দেশের প্রেসিডেন্ট যিনি অবশ্যই বিজ্ঞ মুসলিম ও সামর্থ্যবান পুরুষ হবেন, প্রথমে রাষ্ট্রের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ এবং যোগ্য ও মুত্তাক্বী আলেমকে নিজের জন্য পরামর্শদাতা হিসাবে গ্রহণ করবেন। যাঁরা তখন বা পরে কোন প্রশাসনিক পদে থাকবেন না। অতঃপর তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর থেকে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করে নিজের জন্য একটি মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট নিয়োগ দিবেন। যারা দেশের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিবেন। তবে তাঁদের পরামর্শ মানতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য থাকবেন না। এভাবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যিম্মাদার হবেন প্রেসিডেন্ট। অন্যেরা থাকবেন তাঁর পরামর্শদাতা ও সহযোগী।

ইসলামী পরিভাষায় প্রেসিডেন্ট হবেন 'আমীর'। তবে বর্তমান যুগের প্রেসিডেন্টগণের সঙ্গে 'আমীর'-এর পার্থক্য এই যে, 'আমীর' আল্লাহ্‌র বিধানের বাইরে কোন বিধান জারি করতে পারেন না এবং অহি-র বিধান জারি করতে কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করবেন না। প্রচলিত 'প্রেসিডেন্ট' পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারেন ও যেকোন আইন জারি করতে পারেন। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় 'আমীর' স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারেন না। তিনি সর্বদা আল্লাহ ও মজলিসে শূরার নিকটে এবং জনগণের নিকটে দায়বদ্ধ থাকেন, যা Check and Balance-এর সর্বোত্তম নমুনা হিসাবে কাজ করে।

দেশের বিচার বিভাগ ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিচার করবে এবং তা সর্বদা স্বাধীন থাকবে। 'আমীর' বা যে কোন সরকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেখানে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে এবং তা ইমারতের অযোগ্যতা প্রমাণ করলে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে এবং পার্লামেন্টের অনুমোদন ক্রমে 'আমীর' যেকোন সময়ে অপসারিত হবেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ইমারত -এর যোগ্য থাকা পর্যন্ত বা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল থাকবেন।

'আমীর'-এর মৃত্যু হ'লে তাঁর অছিয়ত বা মনোনয়ন মোতাবেক পরবর্তী আমীর নিযুক্ত হবেন। কিংবা তাঁর অথবা পার্লামেন্ট নিয়োজিত একটি ছোট সাব-কমিটি এ দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা প্রয়োজনে সর্বাধুনিক মিডিয়া ব্যবহার করে নিরপেক্ষভাবে জনমত যাচাই করবেন এবং সার্বিক বিবেচনায় সাধ্যপক্ষে যোগ্য 'আমীর' নির্বাচন করবেন। অতঃপর নিযুক্ত আমীরকে সকলে মেনে নিবেন।

নতুন 'আমীর' পুনরায় 'শূরা' গঠন করবেন। তাদের আনুগত্যের বায়'আত নিবেন ও তাদের পরামর্শ মোতাবেক দেশ চালাবেন। মোটকথা বর্তমানের

বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগের সাথে আইনসভা তথা পার্লামেন্ট সদস্য নিয়োগকেও প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত করা হবে। অর্থাৎ 'মজলিসে শূরা' বা জাতীয় সংসদ সদস্যগণ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হবেন, জনগণের ভোটে নয়। ইসলামী শাসন ও নেতৃত্ব ব্যবস্থায় কেবল 'আমীর' নির্বাচিত হন। অতঃপর তিনি তাঁর শূরা সদস্যদের মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। তাদের মধ্য থেকে বাছাই করা কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে একটি ছোট্ট কেবিনেট বা মন্ত্রিসভা গঠন করবেন।

এর মধ্যে কেউ ডিক্টেটরশিপ-এর গন্ধ পেলে তাকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের লালনক্ষেত্র বলে পরিচিত আমেরিকার কেবিনেট ব্যবস্থার দিকে তাকাতে অনুরোধ করব। যেখানকার সদস্যবৃন্দ সকলেই প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হন এবং তারা প্রেসিডেন্ট-এর নিকট দায়ী থাকেন। সেকারণ বলা হয়, 'আমেরিকার কেবিনেট প্রেসিডেন্টের ইচ্ছারই সৃষ্টি'।[২৮] সেখানকার প্রেসিডেন্ট অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। অধ্যাপক স্ট্রং বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে কোন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মত কোন ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি দেখা যায় না'।[২৯] সামষ্টিক নেতৃত্ব দুর্বল নেতৃত্বেরই শামিল। যা সামাজিক বিশৃংখলার অন্যতম প্রধান কারণ, 'ইসলাম' সর্বদা এককেন্দ্রিক শক্তিশালী নেতৃত্ব কামনা করে, যা সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান শর্ত।

ফলাফল

ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচনের ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, জাতি সর্বদা একদল দক্ষ, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশাসনের সর্বত্র দেখতে পাবে। ৪, ৫, ৬ বছর অন্তর নেতৃত্ব নির্বাচনের অন্যায় ঝামেলা, অহেতুক অপচয় ও জানমালের ক্ষতি থেকে দেশ বেঁচে যাবে। সামাজিক অনৈক্য ও রাজনৈতিক হানাহানি থেকে জাতি রক্ষা পাবে। একক ও স্থায়ী নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে- জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যা আবশ্যিক পূর্বশর্ত। রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে মুক্ত পরিবেশে জাতি একাগ্রচিত্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবে। সর্বোপরি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা দেশীয় রাজনৈতিক দলসমূহকে তাদের এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে নিরুৎসাহ হবে। ফলে তাদের এজেন্টদের অপতৎপরতা থেকে জাতি মুক্ত থাকবে।

---

২৮. *ডঃ এমাজউদ্দীন আহমাদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা (ঢাকাঃ ১৯৬৪) পৃঃ ৭১৫।*
২৯. *ঐ, পৃঃ ৭১০।*

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম

গণতন্ত্রে প্রধানতঃ পাঁচটি লোভনীয় প্রস্তাব রয়েছে। ১- ব্যক্তির বদলে জনগণ ক্ষমতার মালিক হবে। ২- ছোট বড়, ভাল ও মন্দ সকলের সার্বজনীন ভোটাধিকার। ৩- রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সার্বজনীন অধিকার। ৪- সার্বভৌম জাতীয় সংসদ এবং সেখানে অধিকাংশের সমর্থনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ৫- বাক, ব্যক্তি ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় মূলতঃ প্রাচীন যুগের অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সঞ্চিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উক্ত পাঁচটিকে একটি বিষয়ে পরিণত করলে দাঁড়াবে যে, ক্ষমতা একজনের হাতে নয়। বরং সমষ্টির হাতে থাকবে। আরও সংক্ষেপে বলা যায়ঃ 'একক ক্ষমতার অবসান, সামষ্টিক ক্ষমতার উত্থান' -এটাই হ'ল গণতন্ত্রের মূল কথা।

আপাত মধুর উক্ত কথাগুলি কতটুকু বাস্তব সম্মত এবং ইসলামী নেতৃত্বের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব কি-না, এক্ষণে আমরা তা যাচাই করে দেখব।

প্রথম কথা হ'লঃ জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। অথচ বাস্তব কথা হ'ল, কেবলমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ ব্যতীত গণতন্ত্রে জনগণের আর কোন অধিকার নেই। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিরাই ছলে-বলে-কৌশলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণকে যুলুম করে, শোষণ করে ও তাদের অধিকার হরণ করে। পক্ষান্তরে ইসলামী ইমারতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে আল্লাহ্‌র হাতে। ইমারতকে সেখানে জনগণের পবিত্র আমানত মনে করা হয়। সেকারণ আমীর ও তাঁর পার্লামেন্ট সদস্যগণ আল্লাহ ও জনগণ উভয়ের নিকটে জওয়াবদিহী করতে বাধ্য থাকেন। 'আমীর' হন সর্বোচ্চ যিম্মাদার হিসাবে জাতির সবচেয়ে বড় 'খাদেম'।

দ্বিতীয়তঃ সার্বজনীন ভোটাধিকার। সমাজের অধিকাংশ লোকই অদূরদর্শী ও অসচেতন। সর্বোপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এদের ভোটে সৎ ও যোগ্য নেতা নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। ইসলাম একারণে নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকার ঢালাওভাবে সবার হাতে ছেড়ে দেয়নি। বরং সমাজের সর্বোচ্চ চিন্তাশীল, মুত্তাক্বী-পরহেযগার ও যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। আর সৎ ও যোগ্য এবং আল্লাহভীরু লোকের হাতেই কেবল জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে, অন্য কোনভাবে নয়।

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় কোষাগার। গণতন্ত্রে সরকারী দল এই কোষাগার হ'তে যথেচ্ছ ঋণ নিয়ে দেশকে তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত করতে পারে। উক্ত দলের একক চিন্তাধারা অনুযায়ী পুঁজিবাদ বা সমাজবাদ বা যে কোন অর্থনীতি তারা চালু করতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফতে জাতীয় বায়তুল মাল রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ইমারতের

পক্ষ হ'তে ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। ইসলামী অর্থনীতি ব্যতীত সেখানে অন্য কোন অর্থনীতি প্রবেশ করতে পারে না। ফলে আল্লাহ্‌র আইন মোতাবেক মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ সমভাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া অর্থনীতির সুফল ভোগ করতে পারে।

চতুর্থতঃ জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব। কথাটি মধুর শুনালেও মূলতঃ সেখানে সরকারী দলের বা অধিকাংশদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সংখ্যালঘুদের বক্তব্য সঠিক ও ন্যায্য হ'লেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব থাকে আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে আমীর তা প্রয়োগ করেন মাত্র। সেখানে সরকারী ও বিরোধী দলের কোন অস্তিত্ব থাকেনা। ফলে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু বা একাকী, যার বক্তব্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে হবে, তার বক্তব্য গৃহীত হবে। এতে কেবল সংখ্যাগুরু নয়, বরং সকল নাগরিকের অধিকার অক্ষুন্ন থাকে।

পঞ্চমতঃ বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। গণতন্ত্রে এগুলি দলতন্ত্রের কাছে পরাভূত হয়। এমনকি দলের লাঠিবাজদের হুমকিতে বিচারবিভাগ পর্যন্ত শংকিত থাকে। বাক, ব্যক্তি ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ে ইসলামী নীতিমালা অত্যন্ত স্পষ্ট। এসবের বিগত দৃষ্টান্তসমূহ কিংবদন্তীর মত মানব জাতির সোনালী ঐতিহ্য হিসাবে ইতিহাসে রক্ষিত আছে। তবে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা এবং আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শ বিরোধী কোন কথা ও কাজের বল্গাহীনতা ইসলামী শাসন বিভাগ কখনোই কাউকে দিতে পারে না। কারণ তা হবে মানবতা ক্ষুন্নকারী ও সমাজে পশুত্ব বিস্তারে উৎসাহ দানকারী এবং নিঃসন্দেহে তা হবে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী।

অতএব বলা চলে যে, রাজতন্ত্রের উপরে ক্ষুব্ধ হ'য়ে গণতন্ত্র এনে রাজতন্ত্রের ভাল বিষয়গুলি যেমন দক্ষতা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে যেভাবে জন অধিকারকে বিনষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে তেমনি জগাখিচুড়ী গণতন্ত্রের ফাঁদে পড়ে দলতন্ত্রের চোরাবালিতে গণ অধিকার বিলুপ্ত হয়েছে।

ইসলাম রাজতন্ত্রের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদি গুণাবলীকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অধীন করে রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীরকে স্বেচ্ছাচারিতা হ'তে বিরত রেখেছে। সাথে সাথে তাকে জনগণের খাদেম হিসাবে সর্বোচ্চ যিম্মাদারের গুরুদায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক হ'লেও রাজার ন্যায় 'আমীর' স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারেন না। একদিকে আল্লাহ অন্যদিকে মজলিসে শূরার সদস্যদের নিকটে তিনি সর্বদা দায়বদ্ধ থাকেন। সর্বোপরি স্বাধীন ইসলামী আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের দুয়ার যেকোন নাগরিকের জন্য সর্বদা খোলা থাকে। তাই ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা ও তদনুযায়ী দেশ ও

সমাজ পরিচালনাই বড় কথা। কোন তন্ত্র-মন্ত্র বড় কথা নয়।

৭ম শতাব্দীর প্রথম সিকি হ'তে বিংশ শতাব্দীর প্রথম সিকি পর্যন্ত স্থায়ী বিশ্ব ইসলামী খেলাফতের সুদীর্ঘ প্রায় ১৩০০ বছরের সময়কালে এবং বর্তমান শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ইমারতের অধীনে শাসিত জনগণ বিশ্বের অন্যান্য যেকোন দেশের জনগণের তুলনায় নিঃসন্দেহে মানবিক মূল্যবোধের স্বাধীনতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ভোগ করছে, যা এযুগে সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রীদের জন্য ঈর্ষণীয় বিষয় বৈ-কি!

উপসংহার

শুরুতে বর্ণিত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতের নির্দেশ হ'লঃ আমানতকে যথাযোগ্য স্থানে সমর্পণ কর। যোগ্য নেতার নিকটে দায়িত্ব অর্পণের নিয়ম পদ্ধতি আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন চরিত থেকে পেশ করেছি। দ্বিতীয় আয়াতে আমীরের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সংগঠনে 'আমীর' (হুকুমদাতা) ও 'মামূর' (আদেশ পালনকারী)। এ দু'টি স্তর ব্যতীত মধ্যবর্তী কোন স্তর নেই। আমীরের অধীনে সকল মামূরের অধিকার সমান। সমাজের সর্বত্র এইরূপ আনুগত্যের আবহ সৃষ্টি হ'লে সেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক হিংসা, অহংকার ও হানাহানি থেকে সমাজ মুক্ত থাকে। এতে সামাজিক ঐক্য ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। আনুগত্যহীন সংগঠন বা আনুগত্যহীন 'ইমারত' আল্লাহ্‌র কাম্য নয়। এ কারণে হাদীছে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[৩০]

তাই আমীরের আনুগত্যে অনেক সময় দুনিয়া হারালেও আখেরাত লাভ অবশ্যম্ভাবী। ইসলামী সংগঠন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আনুগত্যের এই নিঃস্বার্থ ও পরকালীন প্রেরণার বাস্তব প্রতিফলন রয়েছে। যা অন্য কোন সংগঠনে পাওয়া মুশকিল।

তৃতীয় আয়াতে বিবাদীয় বিষয় সমূহকে ত্বাগূতের কাছে নিয়ে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা মুমিন জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবল আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁর বিধানের বাস্তবায়ন থাকবে, শয়তানের প্রবেশাধিকার থাকবে না। আয়াতের শেষাংশে 'শয়তান' বলতে মানবরূপী শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এরা বিশিষ্ট স্থান দখল করে থাকে। এদের ভিতর ও বাহির এক নয়। দ্বীনদার মুমিনদেরকে এদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। যদিও দুনিয়াদারেরা সর্বদা এদের দিকেই যেতে চাইবে।

---

৩০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬১ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।

সরল-সিধা সাধারণ মানুষকে প্রতারণায় ভুলিয়ে এই ধরনের লোকেরাই আজকের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ফলে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিগণ নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকেন। কেউ ভোটাভুটিতে গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাজিত হন। এছাড়াও অফিস-আদালতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও প্রশাসনে অধিকাংশ স্বার্থপর শয়তানী নেতৃত্বের হাতে এঁরা চোখ বুঁজে মার খান। তাই বর্তমান কালের এই নোংরা নির্বাচন ব্যবস্থার অভিশাপে বিপর্যস্ত সমাজকে বাঁচাতে হ'লে অবিলম্বে ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থা কায়েম করা আশু যরূরী।

ইসলামে নেতৃত্ব নির্বাচনঃ এক নযরে

রাষ্ট্রের একজন নির্বাচিত 'আমীর' বা প্রেসিডেন্ট থাকবেন। তাঁর একটি মনোনীত 'মজলিসে শূরা' বা জাতীয় সংসদ থাকবে। প্রয়োজনে রাষ্ট্রের অন্যান্য গুণী ব্যক্তিদের নিকট থেকেও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করবেন। এম,পি নির্বাচনের প্রচলিত প্রথা থাকবে না। দল ও প্রার্থীভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে না। সরকারী ও বিরোধী দল বলে কিছুই থাকবে না। প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে মেধা, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এবং প্রতিভা বিকাশের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সংগঠন সমূহ থাকবে। জনকল্যাণমূলক বিভিন্নমুখী তৎপরতার মাধ্যমে সৃষ্টির সেবা করা, প্রশাসনকে দিক নির্দেশনা দান এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হবে সকল সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃত সত্য ও কল্যাণ ইসলামেই নিহিত রয়েছে। তাছাড়া পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হ'লেও মানব চরিত্রের কোন পরিবর্তন নেই। অতএব মানবরচিত বিভিন্ন মতবাদ যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ঐশী বিধানের সাথে সংঘর্ষশীল, তা যতই আপাতমধুর হৌক না কেন, আখেরাতে বিশ্বাসী কোন মুমিন তা কখনোই মেনে নিতে পারে না। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবেনা ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।